: প্রথম অধ্যায় :
জীবনানন্দের পূর্ববর্তী সাহিত্যে ঋতু প্রসঙ্গ

প্রাচীন কাল থেকে মানুষের কাছে ঋতুর গুরুত্ব অপরিসীম। বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীতে ছয় ঋতুর ঘূর্ণাবর্তন চলতে থাকে। সারা বছর ধরে ছয় ঋতুর (গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত ও বসন্ত) আবর্তন ভূ-প্রকৃতি ও মানবমনের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ঋতুতে প্রকৃতির সাজের নানা বদল ঘটে, সঙ্গে মানব মনেও বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ হয়। প্রকৃতির মধ্যে গাছ-পশু-পাখি-মাটি-আকাশ-আলো-সবই ঋতুর প্রভাবে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। ঋতু পরিবর্তনের ফলে মানব জীবনে আসে বৈচিত্র্য। কারণ মানবজীবনের জীবিকা, উৎসব ও বিশেষ অনুভূতি অনেকখানি ঋতু নির্ভর। উদ্ভিদ-প্রাণীর সঠিক বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও ঋতুর গুরুত্ব অপরিসীম। ঋতু বৈচিত্র্যে রসমুগ্ধ সমগ্র সাহিত্য সমাজ। তাই সাহিত্যিকদের কাছে ঋতু এক আকর্ষণীয় ও অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রাচীনগ্রন্থ 'ঋক্‌বেদ সংহিতা' থেকেই ঋতুকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে লক্ষ্য করা যায়, --

"পরিস্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদসী সুমেকে।
ঋতাবানঃ কবয়ো যক্ষধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্ম।।"[১] (ঋগ্বেদ সংহিতা)

অথর্ববেদের পার্থিব জগতেও ঋতুকে অনেকখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পার্থিব পরিবেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত এই ছয় ঋতুর নাম উল্লেখ রয়েছে, —

"গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধে মন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায় নীরহোরাত্রে পৃথিবী নো দুহাতাম্।।"[২] (১২/১/১/৩৬)

তবে 'অথর্ববেদ'এ 'শীত' ঋতুটিকে 'শিশির' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্ষাকালকে এখানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ঋতু বলে গণ্য করা হয়েছে। কারণ বর্ষার জল জীবের কাছে অমৃত স্বরূপ। বর্ষা জীবনদায়ী — 'তা জীবলা জীবধন্যা প্রতিষ্ঠাঃ'[৩] (১২/১/৩/২৫) । এই বৃষ্টির কাছে তপ্ত পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর একটি মন্ত্রে রয়েছে - 'মরুদ্ভি প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু'[৪] (৪/৩/৫/৭)। অর্থাৎ এই প্রার্থনা করা হয়েছে যে, বাতাসে সঞ্চালিত মেঘ পৃথিবীকে বর্ষণধারায় সিক্ত করুক। বৃষ্টির ফলে জীবের মধ্যে সঞ্জীবিত হোক আশার ধ্বনি। —

"অপাং রসা ঔষধীভঃ সচন্তাম্। বর্ষস্য সর্গাঃ মহয়ন্তু
ভূমিং পৃথগ্‌জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ।"[৫] (৪/৩/৫/২)

অর্থাৎ বৃষ্টি ঔষধি বৃক্ষ সমূহে জল সিঞ্চন করুক, প্রভূত বর্ষণভূমিকে মহতী করুক। বৃষ্টির আগমনে ভেকেদের আনন্দও বাঁধন ছাড়া হোক । মন্ত্রটি এরকম — "উপপ্রবদ মন্ডূকি বর্ষমা বদ তাদুরি।
মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব বিগৃহ্যচতুরঃ পদঃ।"[৬]
(৪/৩/৫/১৪)

অর্থাৎ হে মন্ডুকি! তুমি উচ্চৈঃস্বরে ডাক। হে তাদুরি! তুমি বৃষ্টিকে বল, তোমার চারপাশ বিস্তৃত করে তুমি যেন হ্রদের জলে বিচরণ করতে পার। 'ঋগ্বেদে'র পর্জন্যসূক্তে বৃষ্টির এবং মণ্ডুকসূক্তে ভেকের কথা রয়েছে।

১. রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ ঃ ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) / হরফ প্রকাশনী - কলকাতা-৭/প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ১৬৯
২. বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ ঃ সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ-সচেতনতা / সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ঃ কলকাতা-৬ / প্রথম সংস্করণ ২০০৬, পৃষ্ঠা ৩৯
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২

ঠিক এরকম ভাব বিদ্যাপতির বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষাঘন পরিবেশে রাধার বিরহের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রাণীর উচ্ছ্বাসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় —

"কুলিশ শতশত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাক ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।।"[১]

কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকেও ভেকের কথা বলা হয়েছে -

"দদ্দরা বাহরন্তি ত্তি কিং দেবো পুহবিং বরিসিদুং বিরমেদি?"[২] (৪।।১৭৫।।) অর্থাৎ ভেকেরা চিৎকার করে বলে, দেবতা, পৃথিবীতে বর্ষণ থামাবেন না।

'শিবপুরাণে'-বিভিন্ন ঋতুতে জলাশয়ে জল সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। অগ্নিপুরাণের ৬৪ অধ্যায়ে জলকে সাক্ষাৎ হরিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। জলের ব্যবস্থার জন্য কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। 'মৎস্যপুরাণে' জলের সংরক্ষণের এসব ব্যবস্থা যাতে করা হয়, তার জন্য বিভিন্ন ফলের কথা বলা হয়েছে । যেমন —

"প্রাবৃটকালে স্থিতে তোয়ে হ্যগ্নিষ্টোমফলং স্মৃতম্।
শরৎকালে স্থিতং যৎ স্যাৎ তদুক্তফলদায়কম্ ।।
বাজপেয়াতিরাত্রাভ্যাং হেমন্তে শিশিরে স্থিতম্ ।
অশ্বমেধসমং প্রাহ বসন্ত সময়ে স্থিতম্।
গ্রীষ্মেহপি তৎ স্থিতং তোয়ং রাজসূয়াদ্বিশিষ্যতে ।।"[৩] (৫৮/৫৪/মৎসপুরাণ)

অর্থাৎ বর্ষাকালে জলাশয় প্রতিষ্ঠায় অগ্নিষ্টোমফল, শরৎকালে ঐ কাজের জন্য একই ফল, হেমন্ত ও শিশির (শীতকাল) কালে ঐ কাজের জন্য বাজপেয় ও অতিরাত্র ফল, বসন্তে অশ্বমেধফল এবং গ্রীষ্মকালে রাজসূয় অপেক্ষা বিশিষ্ট ফল লাভ হয় ।

'মৎস পুরাণ' থেকে জানা যায় যে, সূর্য নিজের কিরণের দ্বারা আটমাস ক্রমান্বয়ে জল গ্রহণ করে এবং চারমাসে তা বর্ষণ করে। সেই বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্নের দ্বারা জগৎ পালিত হয়। 'মৎস্যপুরাণে' আরও বলা হয়েছে, বৃষ্টির জলে উৎপন্ন শস্যের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। বৃষ্টি পরিবেশের রক্ষক হলেও অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি পরিবেশে বিপর্যয় ডেকে আনে —

"অতিবৃষ্টিরণাবৃষ্টির্দুভিক্ষাদি ভয়ং মতম্ ।
অনৃতৌ তু দিবানন্তা বৃষ্টির্জ্ঞেয়া ভয়ানকা ।।"[৪] (১৩১/১/মৎসপুরাণ)

ঋতু অনুরাগী কবি কালিদাস 'ঋতুসংহার' কাব্যে ছয়টি ঋতুর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। ছয়টি ঋতুর সমাগমে প্রেমিকজনের মানসিক অবস্থার মনোরম চিত্র এই 'ঋতুসংহার'কাব্যে তুলে ধরেছেন। ঋতু ও মানব জীবনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক এই কাব্যে দেখানো হয়েছে। 'ঋতুসংহার' এর শুরু হয়েছে গ্রীষ্মের বর্ণনা দিয়ে। গ্রীষ্মের উপস্থিতিতে সূর্য প্রবল তেজ প্রকাশ করে, কিন্তু চন্দ্রমা থাকে মনোরম । তবে কালিদাস গ্রীষ্ম দিনের শেষ অংশকে রমণীয় বলেছেন - 'দিনান্তরম্যোহভ্যুপশান্তমন্মথো নিদাঘ-কালোহয়মুপাগতঃ প্রিয়ে।।[৫] (১)

১. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ৯১
২. মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃকালিদাসের গ্রন্থাবলী/প্রথম ভাগ/বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ঃ কলিকাতা -১২,বারানসী ধাম অনন্ত চতুদর্শী ১৩৩৬,পৃ - ৪০২
৩. বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ ঃ সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ-সচেতনতা / সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ঃ কলকাতা-৬ / প্রথম সংস্করণ ২০০৬, পৃষ্ঠা ৮১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৩
৫. মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃকালিদাসের গ্রন্থাবলী/প্রথম ভাগ/বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ঃ কলিকাতা -১২,বারানসী ধাম অনন্ত চতুদর্শী১৩৩৬,পৃ - ৪৩৫

"প্রচণ্ড সূর্য্যঃ স্পৃহনীয় চন্দ্রমাঃ"[১] (১/১) প্রচণ্ড সূর্যতাপে শস্য ঝলসে ওঠে। বিভিন্ন পশুপাখী, হরিণ, সিংহ, হাতী, সারস, বানর - এদের করুণ চিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর পটভূমিতে তিনি বর্ণনা করেছেন।

কালিদাসের কাছে বর্ষা ঋতু বিরহবোধের উদ্দীপক। বর্ষা বিরহবিধূর প্রবাসীদের উপর প্রেমবাণ বর্ষণ করে । বর্ষার মেঘগুলির আওয়াজ যেন রণদুন্দুভিধবনি, বিদ্যুৎ যেন ধনুকের জ্যা, তীব্রধারা বর্ষণ যেন বাণের তুল্য (১/১৯) । কালদিাস আরও বলেছেন কামিজনের প্রিয় বর্ষা আসে রাজার ভঙ্গীতে —

"সমাগতো রাজবদুদ্ধ তদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে" (২/১)

অথবা,

"প্রয়ান্তি মদং বহুধারবষিণো বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ।।"[২] (৩/২)

অঝোর বর্ষায় ময়ূর, হাতি, হরিণী, নদী ও গিরির সৌন্দর্য, মালতী-বকুল-কদম প্রভৃতি ফুলের শোভাবর্ধন ঘটে থাকে। বর্ষা প্রাণীদের প্রাণস্বরূপ। তাই সকলেই বর্ষা কামনা করে, —

"জলদ সময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু তব
হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।।"[৩] (২/২৮)

শুভ্রমেঘ, কাশফুল, ফুটন্ত পদ্ম, কলহংস, শালিধান এসব শরতের আগমনকে সূচিত করে। প্রকৃতি, পথিক, বিভিন্ন পাখিরা শরতে আনন্দবোধ করে। কবির কাছে শরৎ বধূরূপা। —

"কাশাংশুকা বিকচ- পদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মাদ- হংসরব নূপুর নাদরম্যা।
আপক্কশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা।"[৪] (৩/১)

হেমন্ত ঋতু শস্যে পরিপূর্ণ, কৃষক হেমন্তের আগমনে তাই খুব খুশি। প্রকৃতিতে ও জীবদের মধ্যে হেমন্তের উপস্থিতিতে সাড়া পড়ে যায়। হরিণের বিচরণ, ক্রৌঞ্চে র কলধবনি হেমন্তকে আকর্ষণীয় করে তোলে। বকের মালায় শোভিত এই হেমন্ত যেন সকল সুখের উপরে অবস্থান করে ।

"সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চ মালাপরীতঃ প্রাদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ ।"[৫] (৪/১৮)

এরপর শীত এসে উপস্থিত হয়। এসময় মানুষ ভালোবাসে আগুন ও সূর্যের কিরণ। মানুষ বাতায়ন রুদ্ধ করে রাখে। "প্ররূঢ়শালাংশুচয়ৈর্মনোহরং ক্বচিৎ স্থিতক্রৌঞ্চ নিনাদরাজিতম্"[৬] (৫/১)। আর একটি শ্লোকে শীত ঋতু প্রসঙ্গে উক্তি - "নিরুদ্ধ বাতায়নমন্দিরোদরং হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ।"[৭] (৫/২)

কবি কলিদাস বলেছেন, বসন্তের দিন ও রাত্রি অত্যন্ত মনোরম। আমের মুকুল, গুঞ্জনরত ভ্রমর, গাছে গাছে ফুল, পদ্মের সুগন্ধি বাতাস — এ সমস্ত নিয়ে বসন্তের আগমন। বসন্ত আসায় গাছে গাছে ভ্রমরের ভিড় উপচে পড়ে। অশোক, পলাশ ও কোকিল রোমাঞ্চি ত হয়ে উঠে—

---

১. মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃকালিদাসের গ্রন্থাবলী/প্রথম ভাগ/বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ঃ কলিকাতা -১২,বারানসী ধাম অনন্ত চতুদর্শী১৩৩৬,পৃ - ৪৩৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৪১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৪৬
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৪৭
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৫৬
৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৫৭
৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৫৭

"দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্ব্বং প্রিয়ে ! চারুতরং বসন্তে।।"[১] —(৬/২, ঋতুসংহার)

'কুমারসম্ভব' এর তৃতীয় সর্গে প্রকৃতিতে অকাল-বসন্তের আর্বিভাবের কথা বলা হয়েছে । বসন্তে বিকশিত পিয়াল মঞ্জরীর পরাগ হরিণদের চোখে পড়েছে। ফলে মৃগীর চক্ষু প্রেমের আবেশে নিমীলিত হয়েছে 'শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডয়ত কৃষ্ণসারঃ'[২] (৩/৩৬)। বসন্তের আমের মুকুল আস্বাদনে পুরুষ কোকিল মধুর কূজন করেছে। "চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো য়ন্মধুরং চুকূজ।।"[৩] (৩/৩২) — কবি এই গ্রন্থে বসন্তকালের অপার সৌন্দর্য নির্মাণ করেছেন।

'মেঘদূত' এ মহাকবি কালিদাসের বর্ষার বিস্ময়কর চিত্র রচিত হয়েছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষ পাহাড়ের কোলে একখন্ড মেঘ দেখেছেন। সেই মেঘ যেন হাতির মত বপ্রক্রীড়ায় রত। প্রিয়াসঙ্গীহীন যক্ষ মেঘকে দূত করে তাঁর প্রিয়ার কাছে প্রেমবার্তা পাঠাতে চেয়েছেন। —

"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাল্লিষ্ট-সানুং। / বপ্র-ক্রীড়া পরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।।"[৪]
(পূর্বমেঘ/২)

বর্ষার জলভরা মেঘ দেখে ময়ূরেরা ও আনন্দিত হয়। মেঘের বর্ষণে নদী জলে পরিপূর্ণ হয়। মেঘ অর্ন্তলীন বিদ্যুতের আলোকের দ্বারা কখনও কখনও পথপ্রদর্শিত হয়। "সৌদামিন্যা কনকনিকষ-স্নিগ্ধয়া দর্শয়োধবীং তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূবিক্লবাস্তাঃ"[৫] (পূর্বমেঘ / ৩৭) । দামিনীর চঞ্চ লতা অস্থির করে তোলে কবিদেরকে। গোবিন্দ দাস লিখেছেন — "দশদিশ দামিনী দহণ বিথার।"[৬] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "খরবায়ু বয় বেগে চারিদিকে ছায় মেঘে। / ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো ।।"[৭]

ভারতীয় দর্শনে এবং উপনিষদে প্রতিপাদিত পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমই যে বিশ্ব পরিবেশের উপাদান-তা কবি কালিদাসও স্বীকার করেছেন। গ্রীষ্মের দাবদাহ-দিনের শেষে ম্লান হয়, কিন্তু সন্ধ্যায় আগুনের উজ্জ্বলতা বেশি লাগে। রঘুবংশের রঘু ও সেই অগ্নিতুল্য । —

"দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশণঃ ।"[৮] (৪/১)

'রঘুবংশ'তে দেখা যায়, শরৎকালে সপ্তপর্ণ (ছাতিম) ফুলের গন্ধে মাতঙ্গদের মদবারি বেড়ে যায় (৪/২৩)। দশরথের রাজত্বে দেখা যায় দেশে বসন্ত সমাগমের সঙ্গে অশোক গাছের ফুল ও পাতায় কামনার উদ্রেক হয় — 'কুসুমমেব ন কেবলমার্ত্তবং নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্।'[৯] (৯/২৭)। পঞ্চ মবর্গের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে জলহীন শরৎকালের মেঘের কাছে চাতকেরা কখনও জল চায় না, "স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দ্দতি চাতকোহপি"[১০] (৫/১৭)।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বৈতালিকের উক্তিতে জীবের উপর প্রকৃতির মধ্যাহ্নকালের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যার মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতুর আভাস রয়েছে। এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে মদনসন্তপ্ত রাজা অগ্নিমিত্র প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনে শিহরিত হয়েছেন-'অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ সখে।'[১১] (৩/২৭)। — তিনি মনে করেছেন বসন্ত যেন কোকিল কূজনের দ্বারা জিজ্ঞাসা করছে যে তিনি কন্দর্পযাতনা সহ্য করতে পারছেন

---

১. মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃকালিদাসের গ্রন্থাবলী/প্রথম ভাগ/বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ঃ কলিকাতা -১২,বারানসী ধাম অনন্ত চতুর্দশী ১৩৩৬,পৃ-৪৬০
২. মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃকালিদাসের গ্রন্থাবলী/দ্বিতীয় ভাগ/বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ঃ কলিকাতা -১২,কাশীধাম মহালয়া ১৩৩৬,পৃ - ৪৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৭
৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬২
৬. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ৯১
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গীতবিতান / বিশ্ব সাহিত্য ভবন ঃ ঢাকা ১১০০ / প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০১, পৃষ্ঠা - ৩৬৯
৮. মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃকালিদাসের গ্রন্থাবলী/প্রথম ভাগ/বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ঃ কলিকাতা -১২,বারানসী ধাম অনন্ত চতুর্দশী ১৩৩৬,পৃ - ৪৩
৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৬
১০. তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৪
১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৬২

কিনা ? আর আমের মুকুলের সৌরভে সুবাসিত বাতাসের ছোঁয়ায় স্বয়ং মাধব যেন তাকে শীতল করছেন। বসন্তের আগমনে প্রমোদকাননের সৌন্দর্য্যতা রাজার প্রতি বিদূষকের উক্তিতে ধরা পড়েছে — ''ত্রদং ক্খু ভবন্তং বিঅ বিলোহইদুকামাত্র পমদবনলচ্ছীএ

জুবদীবেসলজ্জাবইওঅং কুসুমনেকথং গহীদম্''[১] --(৩/২৯)

অর্থাৎ প্রমোদবনের সৌন্দর্যলক্ষ্মী আজ রাজাকে বিমোহিত করার জন্যই কুসুমের সাজসজ্জায় বিভূষিত হয়েছে। যুবতীর বেশও এ সৌন্দর্যের কাছে লজ্জা পায়।

'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে কালিদাস নায়িকা উর্বশীকে বসন্তের শোভার সঙ্গে এবং তার উৎসুক সখীদের লতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাজাও বলেছেন, অশোকের রক্তিমতা মনোহারিণী । নতুন আমের মুকুল কপিশ বর্ণ ধারণ করেছে। সুতরাং বসন্তের যেন যৌবন আসন্ন। যেমনভাবে মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে লিখেছিলেন, 'তারার যৌবন বন ঋতুরাজ তুমি'[২]।

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রিয়মিলন, আনন্দ-বিরহের কথা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে' বর্ণিত রয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলা গ্রীষ্মের তাপে কাতর। রাজার অনুভবে —

''সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োর্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগম পরাদ্ধং যুবতিষু।।''[৩] (৩/৬)

শকুন্তলার কাছে গ্রীষ্ম এবং কামনার উত্তাপ দুইই সমান । কিন্তু গ্রীষ্মের তাপ যুবতীদের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলে না, তাই শকুন্তলা মদন-সন্তপ্তা ।

ঋতুচক্রের আবর্তন এবং চন্দ্রের ক্ষয় ও তার বৃদ্ধি কবিদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। ঋতুচক্রের আবর্তনে এক এক ঋতু চলে যায়, তা আবার ফিরে আসে। কিন্তু নদীর জলধারা বা মানুষের যৌবন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসেনা। অশ্বঘোষ তাঁর 'সৌন্দরনন্দ' নাটকে বুদ্ধ দেবের জন্মের সময়কালীন পরিবেশের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে গিয়ে এমনই উক্তি করেছেন । —

''ঋতুর্ব্যতীতঃ পরিবর্ততে পুণঃ ক্ষয়ং প্রয়াতঃ পুরেতিচন্দ্রমাঃ।
গতং গতং নৈবতু সংনির্বর্ততে জলংনদীনাংচ নৃনাংচ যৌবনম্ ।''[৪]

---- (৯/২৮/সৌন্দরনন্দ)

প্রচলিত প্রবাদেও আমরা এই বক্তব্যের প্রতিধবনি শুনি। —

বসন্ত চলিয়া যাবে ফুল ফুটিবে আবার
যৌবন চলিয়া যাবে আসিবে না আর।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বসন্তের নিকট বিদায় '-এ এই ধরনের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন —

---

১. মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃকালিদাসের গ্রন্থাবলী/প্রথম ভাগ/বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ঃ কলিকাতা -১২,বারানসী ধাম অনন্ত চতুদর্শী ১৩৩৬,পৃ- ৩৬২

২. মাইকেল মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য / মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলিকাতা - ৬ / পুনর্মুদ্রণ - ২০১০ - ২০১১ / পৃষ্ঠা - ২৩

৩. রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ঃ কালিদাসের গ্রন্থাবলী /তৃতীয় ভাগ /বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ, কলিকাতা -১২, কাশীধাম মহালয়া ১৩৩৬, পৃ - ৬৭

৪. বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ ঃ সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ-সচেতনতা / সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ঃ কলকাতা-৬ / প্রথম সংস্করণ ২০০৬, পৃষ্ঠা - ১২২

"হা বসন্ত মনোহর.....
ফিরে ফুটাইলে ফুলে লইও সৌরভ তুলে
চুম্বিয়া সে কুসুমের কুল।
কিন্তু রে কভু কি আর আছে আশা ফিরিবার
মানবের যৌবন বসন্ত।।"[১]

মহাকবি ভাস বলেছেন, প্রাকৃতিক পরিবেশের শোভা হল পুষ্পবৃক্ষ। পুষ্পবৃক্ষই রচনা করে প্রমোদবন। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' গ্রন্থে চেটি নামক চরিত্রটি, প্রমোদবন থেকে অঞ্চ ল ভরে শেফালী ফুল তুলে নিয়ে এসেছে। তা দেখে পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা উভয়েই মোহিত হয় । বিদূষকের দৃষ্টিতে প্রমোদবনের সৌন্দর্য্য ধরা পড়েছে এরকম, —"হী হী শরৎকাল-নির্মলেহন্তরিক্ষে প্রসাদিত বললদেব বাহুদর্শনীয়াং

সারসপউক্তিং যাবৎ সমাহিত্ং গচ্ছন্তীং প্রেক্ষতাং তাবদ্ ভবান।" [২]

--- (৪র্থ অঙ্ক / স্বপ্নবাসবদত্তা)

অর্থাৎ শরৎ কি অপরূপ। শরতের নির্মল আকাশে বনদেবতার বাহুর মত দর্শনীয় সারসশ্রেণী দলবদ্ধ ভাবে উড়ে যাচ্ছে। শুধু-বিদূষক নয়, রাজাও শরৎ প্রকৃতির এই শোভা দর্শনে বিমুগ্ধ ।

যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকেরা ঋতুর রূপে মুগ্ধ হয়ে রচনা সৃষ্টি করেছেন। ঋতুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ কালিদাস 'ঋতুসংহার'-এর মতো অসাধারণ ঋতুবিষয়ক কাব্য সৃষ্টি করেছেন। ঋতুর রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে শ্রীহর্ষ লিখেছেন 'নৈষধচরিত'। আবার ঋতুর প্রভাবে বঙ্গদেশের মনোমোহন রূপ এঁকেছেন মহাকবি ভট্টি। ভট্টি প্রণীত 'ভট্টিকাব্যম্' গ্রন্থে শরৎঋতুর অসাধারণ চিত্রের বর্ণনা রয়েছে। শরৎ ঋতু কবি ভট্টির রচনায় এক মানবী প্রতিমার রূপ নিয়েছে। তিনি দেখেছেন শরৎ সমাগমে জলেও স্থলে সর্বত্র বিস্ময়কর সৌন্দর্যের আবির্ভাব ঘটেছে। জলাশয়ে ফুটেছে অজস্র পদ্ম। বনভূমিতে দেখা গেছে বিবিধ ফুলের সমারোহ। দলে দলে ভ্রমরেরা উপস্থিত হয়েছে সেইসব ফুলের মধুপানের জন্য । পদ্ম ও নানা পুষ্পে মধুপানে নিবিষ্ট ভ্রমর যেন জলভূমি ও স্থলভূমির চক্ষুস্বরূপ । তিনি আরও বলেছেন - পদ্ম ও পুষ্পরূপ চোখের ভেতর মধুপানে নিশ্চ ল ভ্রমররা হল চোখের তারা। শরৎ প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য নির্মানে কবি ভট্টি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন —

"বনানি তোয়ানি চ নিলীন ভৃঙ্গিঃ নেত্রকটলপঃ পুষ্পৈঃ সরোজৈঃচ
বিস্ময়বন্তি (সন্তি) পরস্পরাং লক্ষ্মীম্ আদরেণ ইব আলোকয়াঞ্চ ক্রুঃ।"[৩]

বলাবাহুল্য, ভট্টির অসাধারণ কবিত্বশক্তিতে সৌন্দর্যময়ী শরৎ বস্তুত এক খন্ডিতা নায়িকাতে পরিণত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের সাধনসঙ্গীতগুলিতে ঋতুর ভাবনা তেমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়ুচন্ডীদাস প্রকৃতির এক নান্দনিক শ্রী ও সম্ভ্রম মূর্তি অঙ্কন করেছেন। 'বস্ত্রহরণ খন্ড', 'নৌকাখন্ড', 'ছত্রখন্ড' ইত্যাদি খণ্ডে নানা ঋতুর প্রসঙ্গ এনেছেন। 'বস্ত্রহরণ খন্ডে' কবি গ্রীষ্ম ঋতুর কথা বলেছেন। গ্রীষ্মে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে জলকেলিতে মত্ত হয়েছেন —

"উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সম এ।

---

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র) / তুলি কলম ঃ কলকাতা ৯ / নতুন সংস্করণ ২০০৪, পৃষ্ঠা ৯৮৩
২. বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ ঃ সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ-সচেতনতা / সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ঃ কলকাতা-৬ / প্রথম সংস্করণ ২০০৬, পৃষ্ঠা ১২৭
৩. শ্রীমতী রত্না দত্ত ঃ ভট্টি কাব্যম (দ্বিতীয় সর্গ) / সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ঃ কলিকাতা ৬ / তৃতীয় প্রকাশ ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৪
৪. অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য ঃ বড়ু চণ্ডীদাস - শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র / দে'জ পাবলিশিং ঃ কলিকাতা ৭৩ / দশম সংকলন ১৪১১, পৃষ্ঠা ৩১১

শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখা এ।"[৪] --- (বস্ত্রহরণ খণ্ড / শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

গ্রীষ্মকালের গভীর শীতল জল বড়ো সুখদায়ক। সেকারণে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে যমুনার জলে নামার পরামর্শ দিয়েছেন। আবার, 'নৌকাখণ্ডে' বর্ষা ঋতুর কথা রয়েছে। 'রাধাবিরহ' অংশে রাধিকার কাছে 'বারিষা চারি মাষ'[১] হয়ে ধরা দিয়েছে। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন-এই চারটি মাস প্রাণনাথ কৃষ্ণের খোঁজে রাধিকার মন তৎপর থেকেছে। কৃষ্ণকে প্রেম নিবেদনের জন্য রাধিকার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের মতো রবীন্দ্রনাথও এই বর্ষা ঋতুকেই প্রেম নিবেদনের উপযুক্ত সময়কাল বলে গণ্য করেছেন — "এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।"[২] -- (বর্ষার দিনে/মেঘদূত)

আষাঢ়ে নতুন মেঘ দেখে রাধিকার চোখে এসেছে জল —
"আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজ এ।
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুর ত্র।"[৩] -- (রাধাবিরহ খণ্ড)

এ যেন 'মেঘদূতম্' কাব্যের যক্ষ। যে যক্ষ আষাঢ় মাসের প্রথম মেঘ দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মেঘকে দূত করে নিজের প্রেম বার্তা রামগিরি থেকে অলকাপুরীতে পাঠাতে চেয়েছিলেন।

শ্রাবণ মাসের ঘন ঘোর বর্ষাতে রাধার চোখে ঘুম আসে না, কৃষ্ণা বিনা রাধা নিজেকে একাকিনী মনে করেছেন। —
"শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সে জাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।।"[৪]

শ্রাবণ দিনে গোবিন্দ দাসের রাধা ঘন ঘন ঝন ঝন বজ্র পড়ার শব্দ শুনেছেন। বর্ষার মধ্যে রাধা অভিসারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সখীরা রাধাকে বলেছে - তোমার নীল শাড়ী কী এই বর্ষার জলধারা ঠেকাতে পারবে ? — "তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল। / বারি কী বারই নীল নিচোল।।"[৫] প্রকৃতির এরূপ বর্ষার প্রেক্ষাপটে শ্যামবিরহিনীপ্রিয়া রাধা কৃষ্ণকে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভাদ্রমাসের দিবানিশি অন্ধকার। ময়ূর, ভেক ও ডাহুকেরা মিলনের ইঙ্গিতে কোলাহল শুরু করেছে। এমন সময় কৃষ্ণ বিনে রাধার মন ও মন্দির দুইই শূন্য হয়ে পড়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' কবি বড়ুচন্ডীদাস বলেছেন —
"ভাদর মাঁসে অহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।।"[৬]

ভাদ্রের পরিবেশে বিদ্যাপতির লেখাতেও একই ভাবসঞ্চারিত হয়েছে —
'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী

১. অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য্য ঃ বড়ু চণ্ডীদাস - শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র / দে'জ পাবলিশিং ঃ কলিকাতা ৭৩ / দশম সংকলন ১৪১১, পৃষ্ঠা ৪৩৬
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৩০৩
৩. অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য্য ঃ বড়ু চণ্ডীদাস - শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র / দে'জ পাবলিশিং ঃ কলিকাতা ৭৩ / দশম সংকলন ১৪১১, পৃষ্ঠা ৪২৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৪
৫. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ৮৮
৬. অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য্য ঃ বড়ু চণ্ডীদাস - শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র / দে'জ পাবলিশিং ঃ কলিকাতা ৭৩ / দশম সংকলন ১৪১১, পৃষ্ঠা ৪২৪
৭. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ৯১

ফাটি যাওত ছাতিয়া।"[৭]

রাধিকার হিসেব অনুযায়ী আশ্বিন মাসের শেষে বর্ষা শেষ হয়। তখন আকাশ মেঘ মুক্ত হয় এবং প্রকৃতিতে কাশফুল ফুটে ওঠে। তখন যদি রাধিকা কৃষ্ণহীন হন, তাহলে তাঁর জীবন নিষ্ফল হবে —

"আশ্বিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহি আঁ গেলে ফুটিবেক কাশী।।
তবে কাহ্নবিনী হৈব নিফল জীবন।"[১] --- (রাধাবিরহ)

আসলে প্রিয়মিলনের আকাঙ্খা রাধার মনকে বড়ো বেশি উদ্বেল করে তুলেছে।

শরৎঋতুর কথা বড়ুচণ্ডীদাসের 'ছত্রখণ্ড' -ত্র রয়েছে। শরতের রোদে রাধা ও বড়াই দুজনে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রান্ত রাধা ও বড়াই পথে এক গাছের তলায় কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নেন। পরে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গসুখ পাওয়ার আশায় মাথায় ছাতা ধরেন —

"শরতের রোদেঁ রাধা বড়ায়ি বিকলী।
বটে এক তরুতলে খানি এক বসিলী।।"[২]—(ছত্রখণ্ড)

বসন্ত ঋতুর কথা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সবথেকে বেশি রয়েছে। 'তাম্বুল খন্ড' এ কৃষ্ণের মনপ্রাণ বসন্তঋতুতে অস্থির হয়েছে। কৃষ্ণ বলেছেন —

"কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সম এ। তাত মধুকর মধু পীত্র।।
সুর পঞ্চ ম শরগাত্র পিকগনে। তেকারণে থির নহে মনে।।"[৩] — (তাম্বুলখণ্ড)

বসন্তকালে মধুকর মধুপান করেছে। কোকিলরা সুমিষ্ট স্বরে পঞ্চ ম শর গেয়েছে। আর সেকারণে কৃষ্ণের মনপ্রাণ অস্থির হয়ে পড়েছে। এই ঋতুতে রাধিকার মনপ্রাণের অবস্থাও এরূপ হয়েছে, —

"চারিদিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল বহে বসন্তের বাত্র।
আম্বজলে বসী কুয়িলী কুহলে লাগে বিষবাণ ঘা এ।।"[৪]—(বংশীখণ্ড)

বসন্তের বাতাস বইছে। আমের ডালে বসে কোকিল কুহুরব করছে। সে রব রাধার মনে বিষ বাণের মতো আঘাত করছে। 'সরস বসন্তকালে কোকিলের কোলাহলে এ ন আ যৌবন কাহ্নাঞি প্রাণ রে '[৫]— (রাধা বিরহ)। অর্থাৎ সরস বসন্তকাল এসেছে । কোকিলের কূজন শুনে রাধার নবযৌবন কৃষ্ণের জন্য বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বসন্ত ঋতুকে 'ঋতুপতি'[৬] বলে আখ্যায়িত করেছেন কবি বিদ্যাপতি। আনন্দময় ভাবজগতে দেখা যায় এই বসন্ত ঋতুতেই রাধা ও কৃষ্ণের মিলন ঘটেছে। কৃষ্ণকে লাভ করে রাধার জীবন, যৌবন সার্থক হয়েছে। প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গসুখ পেয়ে বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রাধার কাছে মধুময় হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণবিরহে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ করে রাধা যতখানি আর্তনাদ করেছেন, মিলনের আনন্দে আজ তিনি ততখানি পুলকিত। এই বসন্ত ঋতুর লীলা বৈচিত্র্যে মগ্ন কবিরা তাঁদের কবিতায় ছবির পর ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাধা মিলনের আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন — "বিজয় বসন্তরাতে মিলন শয়নে....."[৭] (বৈষ্ণব কবিতা)। লোচন দাসের 'গৌরাঙ্গ বারমাসী' বর্ণনাটি বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের একটি আকর্ষণীয় বিষয়।

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য ঃ বড়ু চণ্ডীদাস - শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র / দে'জ পাবলিশিং ঃ কলিকাতা ৭৩ / দশম সংকলন ১৪১১, পৃষ্ঠা ৪২৪
২. তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৪
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৯১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫৮
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৬৩
৬. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ৯২
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী;কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৭৭

ফাল্গুন মাস দিয়ে বারোমাসের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রত্যেক মাসের বর্ণনা ছয় চরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক মাসের প্রথম চরণগুলি হল — 'ফাল্গুনে গৌরাঙ্গ চাঁদ পূর্ণিমা দিবসে', চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে', 'বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা', 'জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপে তপতসিকতা', 'আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাদুরীর নাদে', 'শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা', 'ভাদ্রে ভাস্কর তাপ সহনে না যায়', 'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা দুর্গা মহোৎসবে', 'কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের' বা, 'অগ্রাহনে নৌতুন ধান্যজগতে বিলসে', 'পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে', 'মাঘে দ্বিগুন শীত কত নিবারিব।'[১]

'শ্রীকৃষ্ণের বারমাসিয়া' গেয়েছেন বৈষ্ণবপদকর্তা বলরাম দাস। তিনি অঘ্রাণ মাস দিয়ে বর্ণনা শুরু করেছেন — "আঘনমাস নাহ-হিয় দাহই শুনইতে হিম-ঋতুনাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির সুন্দরি তুহুঁ ভেলিবাম।।

পৌষ তুষার তুষানলে ডারল নায়রি নাহ।
সুধীরসমীর সুধাকরশীকর পরশ গরলঅবগাহ।।
অহনিশি ডহডহ পিয়া জিউ থিরনহদুঃসহ বিরহকদাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত কতয়ে করব নিরবাহ।।"[২]

মাঘের দিবানিশি শিশিরের স্পর্শে রাধার দেহ অনুক্ষণ কৃষ্ণের প্রতি কাতর হয়ে পড়ে। শ্রীরাধা ফাল্গুনের হিমরাত্রি জাগ্রত অবস্থায় কাটায়। ফাল্গুনে মধুপুর নগরে বিলাসরঙ্গ দেখে কৃষ্ণের অন্তর নিরন্তর ব্যাকুল হয়েছে। বসন্ত মধুমাস বিরহী কৃষ্ণের কাছে খুব দুরন্ত হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ভ্রমরের ঝঙ্কার, বিকশিত কুসুম, দিবানিশি কোকিলের সুমধুর সুর কৃষ্ণের হৃদয়কে অস্থির করে তুলেছে। ফাল্গুনের মধুমাসে তিনি আর দুঃখ সহ্য করতে পারছেন না। শীতল শতদলের উপর শয়নেও সুখ উপভোগ করতে পারছেন না কৃষ্ণ। আষাঢ় মাসে নব জলধর আকাশ ভরে ছড়িয়ে পড়েছে। আষাঢ় মাসের মধুর জলদ ধবনি কৃষ্ণের মনকে বিরহী করে তুলেছে। নব পল্লব দেখে তাঁর মনে হয়েছে বিধাতা এবার সবত্রাস দূর করবেন। শ্রাবণ মাস সম্পর্কে বলেছেন, "শাওন গহন দহন দহ জীবন কিয়ে জানি হরি-বধ পার। / উদ ভাদর দিন নিরখিতে তনুখিন দারুণ দুরভিমান। / বিরহহিলোলহি দর দর অন্তর দোলত চপল পরাণ।। / তুয়া বিনু দিগুন শূন সব মন্দির মনমথ - তৃণসমান। / একল বিকল সকল নিশি বিল্পই অবিরত ঝরয়ে নয়ান।।"[৩] তনু মনমোহন কার্তিক মাসের দিবানিশিতে ঘন ঘন শ্বাস ফেলেছেন। আর বলরাম দাস বলেন, — "তুহুঁ মণি মন্তর তুয়া নাম প্রতিকার নিবেদিল বলরাম দাস।।"[৪]

মঙ্গলকাব্যে ঋতু বর্ণনার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 'বারোমাস্যা' বা 'ষান্মাসিক' বর্ণনার বিচিত্র চিত্রাঙ্কন মঙ্গলকাব্যে প্রায়শই দেখা যায় । এছাড়াও ঋতুর সঙ্গে মানব সমাজের উৎসব, ব্রত, খাদ্য দ্রব্য, প্রেম - এসবের ব্যবহারিক রূপ জড়িয়ে রয়েছে । —"সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।"[৫] (চণ্ডীমঙ্গল / মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)। ভিখারী শিব শীতকালে সুকুতা (সূক্তা) খেতে ভালোবাসতেন - এরূপ বর্ণনা 'চণ্ডীমঙ্গলে' রয়েছে। একদিকে শীতকালে শিবের সূক্তা খাওয়া, অন্যদিকে উদরের জ্বালা নিয়ে বস্ত্রহীনভাবে ফুল্লরার প্রবল শীত কাটানো — শীতের দুই বিপরীত ভাব বেশ আকর্ষণীয়, —

" পৌষে সকল ভোগ সুখী সর্বজন।
তুমি পাড়ি পিছুড়ি শীতের নিবারণ।।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।

---

১. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ৮৫
২. শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখর ঃ মাধুকরী / ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ঃ কলিকাতা - ১২ / প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৯ / পৃ. - ২৪
৩. তদেব ; পৃ. - ২৪
৪. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ৮৬
৫. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা / বামা ঃ কলকাতা ৭৩ / চতুর্থ সংস্করণ জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭৯
৬. তদেব ; পৃ. - ৭৯

জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।"[৬]

মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত বারমাস্যা অনুযায়ী ফুল্লরার বারো মাসের এবং বেহুলার ছয় মাসের দুঃখের বিবরণ আমরা পাই। যে বর্ণনাতে ঋতুচক্রের পালা বদলের সাথে সাথে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ মিলে মিশে রয়েছে, — "পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচন্ড তপন।

খরতর পোড়ে অঙ্গ রবির কিরণ।।"[১] — (ফুল্লরার বারমাস্যা)

আরকান রাজসভার কবি দৌতলকাজী তাঁর লোরচন্দ্রানী বা সতীময়নামতী কাব্যে ময়নার দুঃখের বারমাস্যা বর্ণনা করেছেন। আষাঢ় মাসের বিরহ, শ্রাবণ মাসের প্রিয় মিলনের আনন্দ, ভাদ্রমাসে পঞ্চ শরের মাহাত্ম্য, আশ্বিন মাসের চাঁদ-তারা-কুমুদিনী-ভ্রমর, কার্তিক মাসের মৃত্তিকা আসক্তি, অঘ্রাণ মাসের প্রিয় মিলনের সুখের কথা বলে মালিনী ময়নার মনে ছাতন কুমারের প্রতি অনুরাগ জন্মাবার চেষ্টা করেছে ।

'পদ্মাবতী'তে আবার বারমাসীর পাশাপাশি ষড় ঋতুর বর্ণনাও রয়েছে। 'মেঘদূত' কাব্যে কালিদাস আষাঢ়ের প্রথম দিনটিকে যেমন স্মরণীয় করে রেখেছেন, তেমনি পদ্মাবতীর বারমাসীতে আষাঢ় মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বারমাসী গানের উৎস সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন, —

"একদা মনে করিয়াছিলাম, বারমাসিয়া গানের উৎস কালিদাসের 'ঋতু সংহার'। ঋতু সংহারে নায়ক-নায়িকার কাছে প্রকৃতির বারমাসের ভোগসম্ভার উপস্থিত হইয়াছে ঋতু পর্যায়ের পরিবেশনে। বারমাসিয়া প্রধানত বিরহ ব্যথার-ই ফিরিস্তি। কিন্তু ঋতু সংহারের সঙ্গে প্রকারান্তরে এই মিল থাকিলেও ঋতু সংহার হইতে সোজাসুজি আসে নাই। আসিয়াছে প্রাচীনতর লোকগীতি হইতে। কালিদাস, লোকগীতি হইতেই ঋতু সংহারের কল্পনা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করিতে বাধা কি।"[২]

সুকুমার সেনের এই সিদ্ধান্ত থেকে এই সত্য মিলে যে, 'ঋতুসংহার' বারমাসীর উৎস নয়, বরং বারমাসী জাতীয় লোকগীতিই 'ঋতুসংহারে'র উৎস। প্রকৃতপক্ষে লোককবিদের বারমাসীর অনুকরণেই মধ্যযুগের কবিরা তাঁদের কাব্যে বারমাসী রচনা করেছেন। সৈয়দ আলওলের 'পদ্মাবতী'র বারমাসী বর্ণনাটি নিসর্গব্যাপ্ত বেদনার উৎকৃষ্ট ফসল। স্বামী বিরহক্লিষ্টা নাগমতীর বিরহাবস্থার পরিচয় এ কাব্যে ফুটে উঠেছে। আষাঢ় মাস থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত মোট বার মাসে বিরহিনী নাগমতীর হৃদয় বেদনার আর্তিকে প্রকৃতির চিত্রকল্পের সাহায্যে কবি তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক মাসের বিরহ বর্ণনা চারটি চরণে সীমাবদ্ধ, —

"বিরহে জরিত তনু আছে মাত্র শ্বাস।
অতি ক্লেশে বিরহিনী কান্দে বারমাস।।
প্রথম আষাঢ় মাস বরিষা প্রবেশ।
মোর খণ্ডব্রত ফলে পন্থ নাহি দেশ।।
পূর্ণিত গগন ঘন বরিখে সঘন।
পতি বিনে হতভাগী নিষ্ফল জীবন।।"[৩]

চৈত্র মাসের বর্ণনায় কবি গেয়েছেন — "চৈত্রেতে বসন্ত আইল কামসেনাপতি। / নানা অস্ত্র সঙ্গে করি বধিতে যুবতী।। / কোকিল ভ্রমর পুষ্প নবীন পল্লব। / অধিক দহন প্রাণ সমীর সৌরভ।।"[৪] বঙ্গীয় মঙ্গলকাব্যের রীতিতে

---

১. সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা / বামা ঃ কলকাতা ৭৩ / চতুর্থ সংস্করণ জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা ৭৯
২. সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) / ইষ্টার্ণ াবলিশার্স;কলিকাতা / পঞ্চ ম সমস্করণ -১৯৭০ / পৃ. ৯৫
৩. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পদ্মাবতী (২য় খণ্ড) / কলিকাতা / প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৫ / পৃ. - ২১২
৪. তদেব ;পৃ. - ২১৪

আলাওল বারমাসীর বর্ণনা করেছেন। 'ষটঋতু' বর্ণনার ক্ষেত্রে আলাওল যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। বারমাসী যেন বিরহগীতি - পতিবিরহিনী রমণীর হৃদয় বেদনার আর্তির প্রকাশ এখানে ঘটেছে। 'ষটঋতু' তার উল্টো। ষটঋতুতে বর্ণিত হয়েছে সম্ভোগগীতি। নরনারীর দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সম্ভোগের চিত্র এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। 'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওল জায়সীর অনুরূপে ছটি ঋতু পরিক্রমায় রত্নসেন - পদ্মাবতীর দাম্পত্য জীবনের অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। কবি বলেছেন —

"রত্নসেন পদ্মাবতী এক প্রাণ কায়।
কেলিকলারসে ভুলি থাকন্ত সদায়।।
যেন রাসমণ্ডলে গোপিনী পীতবাসে।
ষটঋতু নানা সুখে ভুঞ্জে নানা রসে।।"[১]

আলাওলের নিজস্ব রচনা বসন্ত রাগের একটি গান অপূর্ব কাব্যময় :

"বসন্তে নাগর বরনাগরী বিলাসে
বরবালা মুখইন্দু স্রবে সুধা বিন্দু বিন্দু
মৃদু মন্দ ললিত অধর মধু হাসে।। .....
হীন আলাওল কহ সতত বসন্ত সুখ
যার রমণী বসতি পতি পাশে।"[২]

এভাবে কবি আলাওল বসন্ত ঋতু থেকে শুরু করে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বাংলাদেশের এই ছটি ঋতুর পরিক্রমায় পদ্মাবতী-রত্নসেনের সুখসম্ভোগ জীবনের চিত্র অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

'শিবমঙ্গল' কাব্যে রামকৃষ্ণ রায় দাস মঙ্গলকাব্যে প্রচলিত রীতি মেনে বারমাস্যার বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে দিয়ে ঋতুর বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই কবির দৃষ্টিতে হেমন্ত ঋতু - "প্রথম হেমন্ত ঋতু মার্গ শীরষে। / গগনে নির্ম্মল চাঁদ তুষার বরিষে।। / পৌষে প্রবল শীতে শয্যার বিলাস / খট্টার শয়ন অট্টালিকায় নিবাস।।"[৩]

রামেশ্বরের 'শিবায়ণ' কাব্যে বিভিন্ন মাসের চিত্র এবং গ্রাম বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। লোককবিরা ভাদুগান, টুসুগানের মধ্য দিয়ে বাংলার গ্রামীন উৎসব নবান্নের গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন — "অঘ্রাণ মাসে নবান্ন / সরুধান কেটে / পৌষ মাসে বাওনি বাঁধা / ঘরে ঘরে পিঠে।"[৪]

গীতিকার 'কঙ্ক ও লীলা' পালাতে লীলার রূপের বর্ণনাতে ঋতুর প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। চাঁদের সমান রূপ, পদ্মফুলের মত তার মুখ, চাঁচর চিকন চুল, আর কাজল কালো চোখের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি দামোদর লিখেছেন —

"কালো কাজলে রাঙা তার দুটি পাশে ।
বর্ষাকাল্যা তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে ।।
হীরা-মতি জ্বলে কন্যা যখন নাকি হাসে ।
সুজাতি বর্ষার জলেরে যেমন পদ্মফুল ভাসে ।।"[৫]

---

১. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পদ্মাবতী (২য় খণ্ড) / কলিকাতা / প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৫ / পৃ. - ২০৬
২. তদেব ; পৃ. - ২০৭
৩. বরুণ কুমার চক্রবর্তী ঃ গীতিকা; স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য / পুস্তক বিপণি ঃ কলকাতা ৯ / প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২২৮
৪. তদেব ; পৃ. - ২২৭
৫. সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, ময়মনসিংহ গীতিকা / ভারতী বুক ষ্টল / মার্চ, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৮৭

ঋতুবৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ। এদেশের মানুষ প্রাকৃতিক দিককে লক্ষ রেখে সমাজ জীবন সম্পর্কিত নিয়ম নীতি তৈরি করেছে। মৈমন সিংহ গীতিকাগুলিতে এর বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। 'শায়ন' মাসে মনসা পূজা করা। কার্তিক মাসে সন্তান কামনায় কার্তিক পূজা করার রীতির কথা বর্ণিত হয়েছে এই গীতিকাতে, —

"কার্তিক মাসেতে দেখ কার্তিকের পূজা।
পরদিমের ঘট আকি বাতির করে সাজা।।"[১]

পূজার্চনার, লোকাচারের ক্ষেত্রে ঋতুর গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম। যেমন বিবাহ সব মাসে অনুষ্ঠিত হয় না। পৌষ মাস বিবাহের পক্ষে বিহিত নয়, দেশাচারের কারণে বিবাহের শুভ সামাজিক অনুষ্ঠান পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয় না। 'মলুয়া' পালায় বর্ণিত — "পৌষ মাসে পোষা আন্দি দেশাচারে দোষ।"[২] বাংলাদেশের মানুষের প্রধান জীবিকা চাষবাস। তাও ঋতুর উপর নির্ভরশীল।

নারী দেহের রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে ঋতু উপমা ব্যবহার করেছেন সাহিত্যিকেরা। 'কমলা' পালাতে কমলার যৌবনের বর্ণনা দানে কবি কল্পনার সাক্ষাৎ মেলে এরূপ —

'আষাইঢ়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে।।'[৩]

অথবা কমলার দীঘল কেশের বর্ণনায় শ্রাবণ মাসের উল্লেখ রয়েছে —

'শ্রাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে।
দাগল দীঘল কেশ বায়েতে বিরাজে।।'[৪]

ঋতুর উপভোগ্য বর্ণনাকে কবি তুলনা করেছেন দ্বাদশ বর্ষীয়া যৌবনবতী সুনাইয়ের বর্ণনার সঙ্গে —

'আষাঢ় মাসে দীঘলা পানসীরেনয়া জলে ভাসে
সেই মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে।।'[৫]

কবি কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্যে বলেছেন মেঘের উদয় হলে নিতান্ত সুখী ব্যক্তির চিত্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপস্যথা বৃত্তি চেতঃ'। বর্ষা সমাগমে পতি বিরহে কাতরা মলুয়ার বর্ণনায় কবি লিখেছেন "আইল আষাঢ় মাস মেঘের বয় ধারা। / সোয়ামীর চান্দ মুখ না যায় পাশরা।। / মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ারা ডাকে রইয়া। / সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া।।"[৬] একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বামীর বিপদাশঙ্কা, অপরদিকে বর্ষার দিনে স্বামীর উষ্ণ সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ লাভে বঞ্চিতা মলুয়ার মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। মনসা পূজার মত দুর্গা পূজার রীতি নীতি নির্দিষ্ট হয়েছে ঋতুর যাওয়া-আসার হিসেব নিকেশের মাধ্যমে। — "ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে। / আনন্দে সায়রে ভাস্যা বসুমাতা হাসে।। / বাপের মণ্ডপ খালি রইল কেবা পূজা করে। / বাপ ভাই মুক্ত হোক দুর্গা মায়ের বরে।।"[৭] (কমলা পালা)

শাক্তপদাবলীর 'আগমনী ও বিজয়া' পর্যায়ের গানে শরৎ ঋতুর কথা পাওয়া যায়। কমলাকান্ত লিখেছেন — "শরৎ কমল মুখে, আধ আধ বাণী মায়ের। / মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখে ঈষৎ হাঁসি, / ভবের ভবন - সুখ ভনয়ে ভবানী।"[৮] শরৎঋতুতে বাঙালীর ঘরে ঘরে চলতে থাকে অম্বিকা পূজা ও কুমারী পূজা। বাঙালীর 'বারমাসের তের পার্বনে' — ঋতুর নানা বৈচিত্র্য প্রকাশিত।

---

১. সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, ময়মনসিংহ গীতিকা / ভারতী বুক ষ্টল / মার্চ, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৮২
২. তদেব ; পৃ. - ৩৬
৩. তদেব ; পৃ. - ১৭৮
৪. তদেব ; পৃ. - ১৭৯
৫. তদেব ; পৃ. - ২৮১
৬. তদেব ; পৃ. - ৭২
৭. তদেব ; পৃ. - ১৭৮
৮. মোহন পাল, শাক্ত পদাবলী / ইউনাইটেড্ বুক এজেন্সি / কলিকাতা - ৬৭, ১৪১৮ / পৃষ্ঠা - ২২২

'মঙ্গল কাব্যে' ভারতচন্দ্র বৈচিত্র্যপূর্ণ ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের উপস্থিতিতে শিবের পঞ্চ তপ বর্ণনা করেছেন। পঞ্চ তপ অতি কঠিন তপস্যা। গ্রীষ্মকালে তীব্র দাবদাহে চারিদিকে আগুন জ্বেলে, বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে, শীতকালে সিক্তবসনে এই তপস্যা করতে হয়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় —

"বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর।।
জ্যৈষ্ঠ মাসে এই রূপে উপরে পঞ্চ তপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবসশবর্বরী ।।
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রঘাত ।
একাসনে বসিয়া রজনী দিনপাত ।।
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা।
উর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা।।"[১]-- (শিবের পঞ্চ তব অংশ)

পঞ্চ মুখে বিবিধ বিধানে স্তবের কথা ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তুলে করেছেন।

আমরা জানি ঈশ্বরগুপ্ত, ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁর কবিতাগুলি রচনা করেছেন। বঙ্কিমের ভাষায় তিনি 'Realist and satirist'[২] এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অর্নিবচনীয় ভাবে ঋতুসম্পর্কিত কবিতা নির্মান করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত ঋতু বর্ণনা করেছেন এরকম —

১) "আর নাহি সহ্য হয় প্রভাকর কর । / মারা যায় তব দাস প্রভাকর কর।।" (গ্রীষ্ম)
২) "বৃষ্টির বাজনা ভাল ঝম্ ঝম্ বাজে তাল / শিখি নিত্য নৃত্য করে সুখে ।।" (বর্ষা)
৩) "আইলেন ঋতুরায় সবল শারদ । / পরিধান পরিপাটি ধবল গরদ।।" (শরৎ)
৪) "দুরন্ত হেমন্ত করে রাজ্য অধিকার। / রহিত করিল রাজ্য শারদ-রাজার।।" (হেমন্ত)
৫) "শীত তুই বেশ বেশ দেখিয়া শীতের বেশ / জানিলাম কে বাবুকে ফেতো।।" (শীত)
৬) "সৈন্যসহ পলাইল মহারাজ শীত । / বলবন্ত বসন্ত হইল উপনীত।।" (বসন্ত)[৩]

ফুল্লরার বারমাস্যাতে দুঃখময় জীবনের ছবি দেখতে পাই। এখানে অভাগী ফুল্লরার থেকেও বড় অভাগা ঈশ্বরগুপ্ত । কারণ শীত এবং পেটের ক্ষুধা দুই-ই তাঁকে জর্জরিত করেছে। "রেতে মশা দিনে মাছি/— এই নিয়ে কলকেতায় আছি।"[৪] — এই উক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে ঈশ্বরগুপ্তের ব্যথাময় জীবনের ছবি। তাঁর দুঃখময় জীবনে শীত ঋতুর চিত্রটি এরকম —

" ঘরে হাঁড়ি ঠনঠনান্তি মশা মাছি ভন্-ভনান্তি
শীতের শরীর কন্কনান্তি
একটু কাপড় নাইকো পিঠে।"[৫]

শীত ঋতুর মতো গ্রীষ্মের দাবদাহের চিত্র তাঁর কবিতায় দেখতে পাই। শরীরের কার্যক্ষমতা গ্রীষ্মকালে কমে যায়, ঘরের বাইরে কেউ বেরোতে পারে না। জল ছাড়া জলাশয়ে জলচর প্রাণীরা মারা যায়। শরীরে ঘাম "টস্ টস্ করে রস ঝরে অবিশ্রাম / দারুণ দুর্গন্ধ গায় পচে যায় চাম।।"[৬] কবির ভাষায় গ্রীষ্মের ঘামাচি (ঘামের ছেলে) ভয়ংকর। তাঁর কথায় গোটা বিশ্বকে নাশ করে দিতে পারে এই গ্রীষ্ম, —

"শস্যচোরা গ্রীষ্মবেটা দস্যু অতিশয়।

---

১. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল / মডার্ণ বুক এজেন্সি ঃ কলকাতা ৭৩ / পূর্ণমুদ্রণ ২০০৮-০৯, পৃষ্ঠা ১১০
২. বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র / তুলিকলম, কলিকাতা - ৯ / ২০০৪ অক্টোবর, পৃষ্ঠা - ৮৫১
৩. বিষ্ণুপদ গোস্বামী ঃ ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)/দত্ত চৌধুরী এ্যাণ্ড সন্স ঃ কলিকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৮
৪. তদেব ; পৃ. - ৬৬
৫. তদেব ; পৃ. - ৭২
৬. তদেব ; পৃ. - ৭২
৭. তদেব ; পৃ. - ৭২

কৃষির কল্যাণ কথা কভুনাহি কয়।।"[৭] —(গ্রীষ্ম)

'গ্রীষ্ম ' কবিতায় কবি প্রখর তপন তাপের কথা জানিয়েছেন এভাবে — "বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ / বারবার কত আর জলে দিব ঝাঁপ।। / প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ। / শূন্য হাতে পড়ে যেন অনলের চাপ"[১] (গ্রীষ্ম)।। গ্রীষ্মকে এতখানি তিরস্কার বোধ হয়, কোন কবি করেন নি। কাতর কবি ছল ছল আঁখি নিয়ে আকাশকে তার সুধার বারিধারা ঝরাতে বলেন—"আর নাহি সহ্য হয় প্রভাকর কর ।/ মারা যায় তব দাস প্রভাকর কর ।। / কাতরে তোমায় ডাকি আঁখি ছল ছল । / দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ।।"[২]

আর এক প্রকৃতি প্রেমিক কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। তিনি 'বৈশাখ' কবিতায় ধরণীর অসহায় রূপ অঙ্কন করেছেন। কবি বলেছেন — "কপালে কঙ্কন হানি মুক্ত করি চুল, / বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল ! / স্বামী তার "চৈত্রমাস" অনঙ্গের মত, / দক্ষিণে ঈষৎ হেলি, জানু করি নত, / কার তপ ভাঙ্গি বারে করিছে প্রয়াস ? / রুদ্রের মূরতি ওযে। একি সর্বনাশ ! / ললাটে অনল, হের, ধক্ ধক্ জ্বলে ! / সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখি লক্ষ তরুতলে, / তপে মগ্ন, — চিনিলে না বৈশাখ দেবেরে ? / হে চৈত্র, এ নিশি - শেষে, নিয়তির ফেরে, / হারাইলে প্রাণ আহা ! নাশিতে জীবন, / রোষান্ধ বৈশাখ ওই, মেলিল নয়ন !"[৩] বৈশাখের রুদ্র মূর্তিকে কবি সুনিপুন ভাবে বর্ণনা করেছেন। কবি বলেছেন, সকালের নবীন উষা, বৈশাখের ক্রোধ সম্বরণের জন্য প্রার্থনা করেছে, কোকিল মুর্হুমুহু মিনতি করে চলেছে বৈশাখকে, অশোক পুষ্প দলেরা বৈশাখকে প্রাণাম জানাচ্ছে, তবুও বৈশাখের দু-চোখ থেকে অগ্নিশিখা নিঃসরণ হয়ে চলেছে। বৈশাখের আগমনে চৈত্র ভস্মীভূত হয়েছে। অনাথিনী হয়েছে বাসন্তী যামিনী। বাসন্তী তার ললাট থেকে সিন্দুর বিন্দু মুছে দিয়েছে বৈশাখের উপস্থিতি হওয়ার জন্য। শাল্মলী পুষ্পরাশি ঝরে পড়েছে। পাপিয়া বসন্তরাজ্য ছেড়ে পলাতক হয়েছে। বৈশাখের খরতেজ দেখে প্রজাপতিরা করবীর ভিড়ে লুকিয়ে পড়েছে। শিরীষ পুষ্প নয়নের নীরে ভিজে গেছে। গাছের উচ্চশাখা থেকে লতাগুলি তরুর চরণে লুটিয়ে পড়েছে। একরকম পুরো বনস্থলী যেন নবীন যৌবনেই পতিহীন হয়ে পড়েছে। বৈশাখের দিনের দীর্ঘতা ও রাত্রির সংক্ষিপ্ততাকে কবি দেবেন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন এভাবে —

দিন বলে "এবে আমি খেটে হব সারা,"
রাত্রি বলে "হায় আমি এবে আয়ু হারা।"[৪]

স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস প্রকৃতির বুকে শরতের অপূর্ব শোভা দেখেছেন শিশির ঝরে পড়ার মধ্যে। তিনি লিখেছেন 'উষার শিশির' নামক কবিতা। — "শরতের সোনা উষা ঘুম ভেঙে চায়, / জগৎ ভিজিয়া আছে শিশিরের জলে। / সুন্দর সবুজ মাঠ কিবা শোভা পায়, / সাদা পুঁতি গাঁথা যেন শ্যামল আঁচলে।"[৫] শরতের সোনা রঙের উষার আলোয় সবার ঘুম ভেঙে যায়। শিশিরের জলে জগৎ ভিজে ওঠে। সবুজ মাঠ শিশিরে সুন্দর শোভমান হয়। ঝোপে মাকড়সার জালে আটকে পড়া শিশির দেখে মনে হয় পৃথিবীর শ্যামল আঁচলে গাঁথা রয়েছে সাদা সাদা পুঁতি। তাতে আবার হিমকণাও ঝরে পড়েছে কত। বাগানের শত শত ফুলগুলিও নিশার শিশির পেয়ে সুদৃশ্য হয়ে উঠেছে। ফুলবালিকারা রজনী শেষ হয়ে গেলে শোকাকুলা হয়ে পড়ে। শিশির তাদের কাছে স্নেহের অশ্রু। কবি বলেছেন সকালের উষা এই শিশিরকে

১. বিষ্ণুপদ গোস্বামী ঃ ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)/দত্ত চৌধুরী এ্যাণ্ড সন্স ঃ কলিকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৮
২. তদেব ; পৃ. - ৬৯
৩. শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখর ঃ মাধুকরী / ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ঃ কলিকাতা - ১২ / প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৯ / পৃ. - ১০২
৪. তদেব ; পৃ. - ১০২
৫. তদেব ; পৃ. - ১০৪

মনোহর চুম্বনে শুষে নেয়।

প্রমথ চৌধুরী একটি কবিতায় বসন্তের অনির্বচনীয় রূপের বর্ণনা করেছেন। তিনি 'চেরি পুষ্প' কবিতায় বলেছেন, যদিও বসন্তের আগমন ঘটতে দেরি রয়েছে, তবুও এখন পর্বতের স্তরে স্তরে তুষারকে বিরাজিত হতে দেখা যাচ্ছে। ঊষার রঙ গোলাপী হয়ে উঠেছে। চেরি গাছের ফুলগুলি লাজমুখে শাখায় শাখায় ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে উঠেছে। চেরিগাছের অঙ্গে কুঙ্কুম ফোটার সময় উপস্থিত হয়েছে। চেরী ফুলের ভাষাই ভেরি বাজিয়ে বসন্তের আগমনের ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয় চেরি পুষ্প বাসন্তী, উমা, শিবের মুখ দর্শনের আবাহন রচনা করে। তাই কবি প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, —

"বসন্তের ঘোষণার তুমি রত্ন ভেরী!
মর্মর-কঠিন-শুভ্র-তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙ্গিন আলোক,
পূর্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব দরশনে।"[১]

ঋতু সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, আর এক কবি কালিদাস রায়। তিনি ঋতুর বর্ণনা নিয়ে 'ঋতুমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন। 'ঋতুমঙ্গল' কাব্যের প্রথম কবিতার নাম দিয়েছেন 'ঋতুলক্ষ্মী'। 'ঋতুলক্ষ্মী'তে তিনি ঋতুর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। যদিও কবি কালিদাস এই কবিতার পংক্তিগুলি 'সাহিত্যদর্পন' ও 'মেঘদূত' কে অনুসরণ করে নির্মান করেছেন, তবুও কবি কালিদাসের ঋতুর রঙ্গকথা বড় মধুর হয়ে উঠেছে - "নিদাঘে তোমার রুদ্রাণীরূপ, ইন্দ্রানী বরষায়, / শরতে শুভ্রা বাগদেবী তুমি, ভাস্বর তব কায়। / শ্যাম হেমন্তে কল্যাণী রমা, অন্নপূর্ণা শীতে, / প্রেম বসন্তে ফুলধনু রচ' রতিরূপে অটবীতে। / ষট পদরুত ষড়রাগে তব লীলা হিন্দোলে দোলে, / মৃত্তিকা পরে কৃত্তিকা তুমি ষড়ানন তব কোলে।"[২] — (ঋতুলক্ষ্মী/ঋতুমঙ্গল/কালিদাস রায়)

'অশেষ শ্যামল বাসবিস্তারে শ্যামলা যাজ্ঞসেনী'র অফুরন্ত বসনের সঙ্গে প্রকৃতির অশেষ শ্যামলতার তুলনা করেছেন। কার্ত্তিক ধাত্রী কৃত্তিকা রূপ ছয় ভগিনীর মতোই প্রকৃতিলক্ষ্মীর কোলে ছয়ঋতু দোলায়মান। কবি-অশেষ নৈপুণ্যে ঋতুলক্ষ্মীর প্রতিমা নির্মান করেছেন । তাঁর মনোমোহিনী ঋতুলক্ষ্মী আর্বিভূত হয় এভাবে — "পদঘাত তব, শুষ্কশাখায় অশোকের বিকাশক, / সাধু-গণ্ডুষে বকুল বিলসে, অশ্লেষে কুরবক। / পরশে তোমার ফুটে প্রিয়ঙ্গু, মন্দার মধুভাষে, / বদন মারুতে চূত মঞ্জরী, চম্পক, মৃদুহাসে, / সঙ্গীরসে নমেরু বিকসে - নটনে কর্ণিকার, / তিলক কুসুম পুলক শিহরে - দৃষ্টির উপহার। / হস্তে তোমার লীলারবিন্দ, কুন্দ অলক' পরে / লোধ্র পরাগে গণ্ড তোমার পাণ্ডুর শোভা ধরে, / চূড়াপাশে তব নব কুরুবক, শ্রবণে শিরীষ দুল, / চারু সীমান্তে পলিকাঞ্চি ত শোভে কদম্বফুল।"[৩] — (ঋতুলক্ষ্মী / ঋতুমঙ্গল/কালিদাস রায়)

ষড়ঋতুর বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত প্রকৃতির ফুলদল দিয়ে কালিদাস রায় তাঁর ঋতুলক্ষ্মীর ভূষণ নির্মান করেছেন। তিনি তাঁর ঋতুলক্ষ্মীকে শুধু বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের ফুলে ভূষিত করেন নি, তার বন্দনা গানও গেয়েছেন। প্রকৃতি থেকে ফুলদল চয়ন করে তিনি ঋতুলক্ষ্মীর অঞ্জলি ও অনুধ্যান করেছেন। 'প্রাচীন কবিদের বসন্ত' কবিতায় কালিদাস রায় লিখেছেন, —

---

১. শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখর ঃ মাধুকরী / ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ঃ কলিকাতা - ১২ / প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৯ / পৃ. - ১৩৯
২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ /দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা ৭৩/ দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৭৩
৩. তদেব ; পৃ. - ১৭৩
৪. তদেব ; পৃ. - ১৭৬

"আজিকার মধু-মিলনোৎসবে তরুলতারাও পড়েনি বাকি।"[৪]

এর সঙ্গে তুলনীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শাশ্বতী' কবিতার দুই পংক্তিখানি, —

"মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি,
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা।"[১] — (শাশ্বতী)

'প্রাচীন কবিদের বসন্ত' কবিতায় কালিদাস লিখেছেন - "ফুটিল চম্পা নেপালী নারীর কুঙ্কুম মাখা মুখের মতো।"[২] 'ব্যর্থ বসন্ত' কবিতায় শুনিয়েছেন - "কুহুস্বরের পিচকারিতে ছুটল তাহার রঙীনধবনি।"[৩] আর বৈষ্ণব পদাবলীতে এই সুর ধবনিত হয়েছে "ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।"[৪] গ্রীষ্মের লাঞ্ছনায় জর্জরিত প্রকৃতির দৃশ্যটি এরকম —

"জীবন-সমরে সহি ক্ষতি-ক্ষয়, লাঞ্ছনা শিরে শত,
ছায়াতরুগুলি আজিকে নিরীহ বাঙালী গৃহীর মত।"[৫] —(নিদাঘ)।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর লেখার জগতে যাদু সৃষ্টি করতে ঋতুকে অন্যতম সাথী হিসেবে গ্রহণ করেছেন । গ্রীষ্ম ঋতুর কথা তাঁর অনেক কবিতাতে রয়েছে । মূলতঃ গ্রামের পরিবেশকেই তিনি বেছে নিয়েছেন ঋতুর বর্ণনা দিতে গিয়ে । গ্রীষ্ম ঋতু ছাড়াও অন্যান্য ঋতুর প্রকাশ তাঁর কবিতাগুলিতে কমবেশি লক্ষ্য করা গেছে । অনেক কবি সাহিত্যিকদের মতো সরাসরি ঋতুকে কেন্দ্র করে তিনি রচনার নামকরণ করেছেন । ঋতুবিষয়ক কবিতাগুলির নাম রেখেছেন এরকম ঃ 'গ্রীষ্মের সুর', 'বর্ষা', 'গ্রীষ্মচিত্র', 'ভাদ্রশ্রী', 'বর্ষানিমন্ত্রণ', 'চিত্রশরৎ', 'বর্ষাবোধন', 'গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে', 'বাসন্তীর স্বপ্ন' ইত্যাদি ।

গ্রীষ্মের রুদ্র রূপ দেখে কবির মনে হয়েছে এ এক প্রকৃতির কঠিন ব্রত । এ ব্রতে হর্ম্ম্যতল, জল, স্থল, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে, চারিদিকে শুধু অগ্নিকণা ঝরে পড়ে । প্রকৃতির কাছে গ্রীষ্মের উপস্থিতি হল দুঃসময় । এসময় মানব হৃদয়েও কোন আনন্দ নেই । দীর্ঘশ্বাসে অস্থির প্রাণ গ্রীষ্মের অবসান কামনা করে । দগ্ধ দেশে, তৃষ্ণাতুর প্রাণে, ক্লান্ত চোখে মানুষ গ্রীষ্মের অবসান চায় । গ্রীষ্মের ব্যথিত সুর বসন্তের বিদায় বেলা থেকেই কবি শুনতে পেয়েছেন । সত্যেন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের কঠিন পরিস্থিতিকে 'দেবতার কোপ'[২] বলেছেন । বসন্তের বিদায়ে কবির হতাশাপূর্ণ অনুভব --

"হায় !
বসন্ত ফুরায় ।
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গুসম লুপ্ত আজি, মূহ্যমান প্রাণ ।"[৬] --- (গ্রীষ্মের সুর)

আরেকটি কবিতায় দেখা যায়, একটি গ্রামের গ্রীষ্মের চিত্র । সেখানে 'বৈশাখের খরতাপে মূর্চ্ছাগত প্রাণ' । পাতায় পাতায় বায়ু মন্থর বেগে প্রবাহিত হয়েছে । গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পেকেছে আম । আমের সুগন্ধে মেতেছে মৌমাছিরা, মেতেছে পাড়ার ছেলের দল । ভীষণ রোদের ঝাঁঝে ডোবা শুকিয়ে গেছে। মাঠে ঘাটে ধরেছে ফাটল । রৌদ্রের দগ্ধতায় গাভীর দল প্রবেশ করেছে বাগানে । রাখাল ঘুমিয়ে পড়েছে বটের শীতল ছায়ায় । তৃষ্ণার্ত কাক একটু জলের আশায় বসেছে কুয়ার দড়িতে । মহালে মহালে নেমেছে তন্দ্রা । সারা গ্রাম স্তব্ধ । পল্লীর ঘরে ঘরে দুয়ার ভেজানো । কবি গ্রীষ্মের দগ্ধ দৃষ্টির অবসানে দেখেছেন

১. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা / এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স / কলিকাতা ৭৩ / পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮ / পৃষ্ঠা ৭৩
২. শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখর ঃ মাধুকরী / ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ঃ কলিকাতা - ১২ / প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৯ / পৃ. - ১৫৬
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬১
৪. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ৯৫
৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কাব্য সঞ্চয়ন / দে বুক স্টোর ঃ কলকাতা ৭৩/সপ্তম কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮ / পৃষ্ঠা ১২
৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কাব্য সঞ্চয়ন / দে বুক স্টোর ঃ কলকাতা ৭৩/সপ্তম কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮ / পৃষ্ঠা ১২

বর্ষার ছন্দ হিল্লোল ধবনি । ---

"দগ্ধ দৃষ্টি বিশ্ব সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন ।
গ্রীষ্ম নিঃশেষ ! জাগছে আশ্বাস ।"[১] --- (ছন্দ হিল্লোল)

কবি বলেছেন, বিস্তৃত বিশাল পৃথিবীতে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন রাজার মতোই প্রতাপশালী । কবির ভাষায় নীলাকাশের মহোচ্চে গ্রীষ্ম অবস্থান করে । তিনি দেখেছেন গ্রীষ্মের অনলে সুদূর কাননভূমি স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে। নারীরূপা বসুন্ধরা অনল শাড়ী পরে মূর্চ্ছাহত হয় । গ্রীষ্মের দুপুরে সূর্যের নিঃসারিত খরতেজে ভীত শিশুরা ঠাঁই নেয় মাতৃক্রোড়ে ।

কবি দেখেছেন গ্রীষ্মের দুপুরে --- 'মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযুষের ধারা"[২]---(গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে)। ঘনবর্ষার যবনিকা খুলে কাশফুল প্রকৃতির বুকে দেখা দিয়েছে । ধরণীতে ছড়িয়ে পড়েছে শারদ জোছনা । ধূলি ধূসরিত জগতে আলো করে ফুটেছে শাদা শাদা কাশফুল । ঘাসের সাগরে ফেনিল হয়ে উঠেছে কাশের মুকুল । কবি 'কাশফুল' কবিতায় বলেছেন -- "যেন শারদ জোছনা অমল করিতে / ধরণী ধরেছে তুলি । ..... ওগো জোছনায় রং ফলাইতে চায় / কাশের ক্ষুদ্র তুলি ।"[৩] (কাশফুল)। প্রকৃতির বুকে কবি বর্ষাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন --- "এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে, / কমল চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে । / শীতল হাওয়া নিতল রসে / বনের পাখি ঘনিয়ে বসে;/ আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন দুলাবে;/ এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে "[৪] -- (বর্ষা নিমন্ত্রণ)।

বর্ষার অপূর্ব রূপ দেখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ । বর্ষাতে তিনি দেখেছেন ইলিশের নাচন । ঝরঝর বর্ষায় ইলিশ মাছেরা "কেউ বা নাচে জলের তলায়, / ল্যাজ তুলে কেউ ডিগবাজী খায় ।"[৫] অথবা বর্ষাতে আরেকটি অপূর্ব দৃশ্যের কথা বলেছেন --

"ধানের বনের চিংড়িগুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নুলো
ব্যাঙ ডাকে ওই গলা ফুলো
আকাশ গলেছে;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে ।"[৬] -- (ইলশে গুঁড়ি)

বিচিত্র রমণীয় দৃশ্য সত্যেন্দ্রের বর্ষা প্রকৃতির বুকে নেমে এসেছে । কেলি কদমের মুকুল, কেকাধবনি, তালের বড়া, ভেজা বাবুই, কেয়াফুল, আলতাপাটি শিম, মেঘের কোলে রোদ, বৃষ্টির রিমঝিম, নেবুফুলের গন্ধ এমনই বিচিত্র দৃশ্য হাজির হয়েছে বর্ষার দিনে । বন থেকে বনান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে কদম ফুলের মৃদু মধুর সুবাস । বর্ষাকে কবি 'পাগলি' বলেছেন --- 'বাদল হাওয়ায় আজকে আমার পাগলি মেতেছে"[৭] (বর্ষা)।

কোন কোন কবিতায় তিনি বর্ষা ও শরতকে একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন । প্রকৃতির বুকে বাদল

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কাব্য সঞ্চয়ন / দে বুক স্টোর ঃ কলকাতা ৭৩/সপ্তম কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮ /পৃষ্ঠা ১৭২
২. তদেব ; পৃ. - ২১০
৩. তদেব ; পৃ. - ১৬
৪. তদেব ; পৃ. - ৯৭
৫. তদেব ; পৃ. - ৯৫
৬. তদেব ; পৃ. - ৯৫
৭. তদেব ; পৃ. - ১৮

বাতাস এবং আকাশে শরতের নতুন মেঘ কবিতায় দুই চিত্র অঙ্কন করেছেন । বর্ষাতে নারীর আঁচলে লুকায়িত থাকে যুথির মালা, শরতে ক্ষরিত মধুর সুবাসে কিশোর প্রাণে জেগে ওঠে প্রেমের অনুভূতি । তারপর কবি দেখেন শরৎ এসে সারা পৃথিবী অধিকার করে আছে "শরৎ এখন করিছে শাসন বিপুল ধরা ।"[১]– (বর্ষা নিমন্ত্রণ)

শরতের কমলা- মসী-সোনা রঙের আলোতে কবি মেঘকে গড়িয়ে চলতে দেখেছেন। ভোরের আলোয় পদ্মফুল পাপড়ি মেলে ধরেছে । অপূর্বভাবে ঋতুরাণী শরৎ চিত্রিত হয়েছে কবির লেখায়,— "কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে। / মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎরাণী পান খেয়েছে। / মেশামেশি কান্নাহাসি, নরম তাহার বুঝবে বা কে ! / এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে !"[২] (চিত্রশরৎ) কবি নজরুল ইসলাম বর্ষার মেঘ সম্পর্কে 'বর্ষা বিদায়' কবিতায় বলেছেন —

"ওগো ও কাজল মেয়ে,
উদাস আকাশ ছল ছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে।
কাশ ফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেখে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।
ওগো ও জলের দেশের কন্যা! তব ও বিদায়- পথে
কননে কাননে কদম কেশর ঝরিছে প্রভাত হ'তে।"[৩]

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রিয় ঋতু বর্ষাকেই সবচেয়ে বেশি করে কবিতায় এনেছেন। 'বর্ষা' কবিতায় কবি ঈশান কোণে মাঠের পারে বর্ষাকে শালের বনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তারপর তিনি দেখেন হঠাৎ হেসে বর্ষা দৌড়ে আসে। একপশলা বৃষ্টি পাগ্‌লি মেয়ের মতো খেয়ালের ঝোঁকে ঘরমুখো পায়রাগুলিকে ভিজিয়ে দেয় । তারপর বর্ষা বজ্রহাতের তালি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে ফিকফিকিয়ে হেসে ওঠে। সে হাসিতে বুকের ভিতর রক্তধারা পর্যন্ত নেচে যায়। তখন ময়ূর ও ভেকের দল বর্ষাকে যেন বলে —

"ময়ূর বলে 'কে গো?' এ যে আকুল করা রূপ !
ভেকেরা কয় নাই কোনভয়', জগৎ রহে চুপ,
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগলি কাঁদেহায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।"[৪]--- (বর্ষা)

শীতঋতুর শীতলতা বড়ই কষ্টদায়ক । কিন্তু অবোধ শিশুরা শীতের কাতরতা অনুভব করতে পারে না। ছোট্ট মিষ্টি খুকীর শীতের দিনে ভারী দুষ্টুমিপনা দেখে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন— "শুধু শুনে ঘুমকি আসে? শরীর আড়ষ্ট। /শীতের দিনে নাইকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয়। / দেখ মা ! আমার এদের কথা ভাবলে বড় দুঃখ হয়।"[৫] -- (খুকীর বালিশ)

'নমস্কার' কবিতায় কবি শীতকে দেখেছেন রাজপথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে । কবিও শীতের সঙ্গে হিম রাজপথে প্রতীক্ষা করেছেন ঋতুরাজ বসন্তের জন্য । শীতের ত্যাগেই যেন বসন্তের সূচনা হয় । তাই কবি শীতকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন । আবার বসন্তের সাকার রূপে মুগ্ধ কবিপ্রাণ বসন্তকেও নমস্কার

---

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কাব্য সঞ্চ য়ণ / দে বুক স্টোর ঃ কলকাতা ৭৩/সপ্তম কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮ / পৃষ্ঠা ৯৭
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৯
৩. নজরুল ইসলাম ঃ সঞ্চি তা / ডি এম লাইব্রেরী ঃ কলকাতা ৬ / ৪৮ তম সংস্করণ ঃ ১৯৯৭ / পৃষ্ঠা ২২২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৮
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২২০

জানিয়েছেন। কারণ কবি জানেন বসন্তের আবির্ভাবে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীজগৎ উল্লসিত হয়। প্রকৃতিতে পড়ে যায় আনন্দের সাড়া । বিশেষ করে মানবাত্মায় অনুভূত হয় প্রেমের সৌরভ । কূজনে - গুঞ্জনে - গানে আবির্ভূত হয় ঋতুরাজ বসন্ত । "অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,— /নমস্কার ! করি নমস্কার "[১]--- (নমস্কার)! বসন্তের আগমনে দখিনা বয়। অসাড় বনে আনন্দের সাড়া পড়ে য়ায়। সিন্দুর বিন্দুর মতো 'সিংহল' দ্বীপ কাঞ্চ নময়, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । যে দেশ রাক্ষসের, যক্ষের — সেই কল্পকাহিনীর দেশেও বসন্তের দক্ষিণা সমীরণ প্রবাহিত হয় "ওই ফাল্গুন আর দক্ষিণ বায় -- সিংহল তার ঘর ।"[২] কোকিলের সুমধুর কূজনে প্রাণের আলো প্রজ্জ্বলিত হয় । কবির কথায়— "বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা, / কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা"[৩]--- (কালোর আলো)!
ঋতুরাজ বসন্ত ও ঋতুরাণী শরৎ এর চিত্র সত্যেন্দ্রনাথ এমনই সুন্দর করে তুলে ধরেছেন ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাব্য রচনার প্রথম দিকে প্রকৃতির ঐশ্বর্যময়ী রূপের কথা অস্বীকার করেছেন । ষড়ঋতু তাঁর হাতে ষড়রিপুতে পরিণত হয়েছে 'ষড়ঋতু ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য্য'[৪] । ঋতুর রঙ্গ কথা নয়, ব্যঙ্গ কথা, প্রকৃতি জগতে ঋতুর অস্তিত্ব ছলনাময়ী বারাঙ্গনা নারীর মতো প্রতারক বলে কবি চিহ্নিত করেছেন। "জ্যৈষ্ঠ দুপুরে শ্রেষ্ঠ শহরে পথ চলি আর ভাবি;/ কতনা বকুল দিল তার ফুল মিটাতে নরের দাবী"[৫]-- (পাষাণ পথে / মরুমায়া)। প্রেমের মিথ্যাচারিতা ও প্রকৃতির ছলনাজাল কোনভাবেই কবিকে ফাঁদে ফেলতে পারেনি । কবি বলেছেন, 'বিষম বোশেখী রোদ পোড়দহ স্টেশনে / আগুন হয়েছ তেতে টিন ।'[৬]-- (প্রেমের স্পর্ধা)। ষড় ঋতুর ক্লেশকর চিত্র আঁকতে কেতকী, চম্পা, বকুল ইত্যাদি ফুলকে তিনি অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন । তাঁর কবিতার বসন্ত ঋতুর মধ্যে সুন্দরের ও সুখের উপস্থিতি নেই ।

আমরা যতীন্দ্রনাথকে 'দুঃখবাদী' কবি পরিচিতিতে জানি । যখন অন্যান্য রোমান্টিক কবিরা কবিতা সৃষ্টি করে থাকেন, তখন তাদের কাছে শ্রাবণের বৃষ্টি ভেজা তরুণী প্রেমের মিনতি নিয়ে উপস্থিত হয় । কিন্তু কবির কবিতা সৃষ্টিকালে অতিবৃদ্ধ ডাবওলা শীত রাতে কচিডাব কেনার আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে -- "তাও নহে বৈশাখী দুপুরে, / মিটাতে প্রাক্তন দেনা, / শীতরাতে ডাব কেনা ! /তাই কি কাটারি আছে ঘরে "[৭]— (কচিডাব)। বৈশাখী দুপুর নয়, শীতরাতে, জনবিরল রাস্তায়, উত্তুরে হিমেল বাতাসে বৃদ্ধের আগমন এক অতি করুণ দৃশ্য । যদিও কবি যতীন্দ্রনাথ এঁকে তাঁর পরম আরাধ্য দেবতা শিবজ্ঞানে জীবসেবা করেছেন । যে দেবতা বিশ্বকে রক্ষার জন্য বিষ পান করে নীলকণ্ঠই হয়েছিলেন। তাঁকে পেয়ে কবি আনন্দিত হয়েছেন।

বর্ষার বন্দনায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি । বর্ষাতে রবি কবির হৃদয় ময়ূরের মতো নেচে উঠেছে । কিন্তু বাস্তববাদী কবি যতীন্দ্রনাথ বর্ষাকে দেখে বলেছেন -- "আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে জেয়াদা / দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা ! / শহরে বরষা ঝরে, / মেঘদূত ঘরে ঘরে / গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা ?"[৮] --- (পথের চাকরী)

এই ভরা বর্ষাতেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে"[৯] যতীন্দ্রনাথ দেখলেন বর্ষার আর এক রূপ --

---

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কাব্য সঞ্চ য়ণ / দে বুক স্টোর ঃ কলকাতা ৭৩/সপ্তম কলেজ স্ট্রীট সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৮/পৃষ্ঠা ১৭৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০
৪. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;যতীন্দ্রনাথ কাব্য সম্ভার / মিত্র ও ঘোষ;কলিকাতা-১২ / প্রথম প্রকাশ আশ্বিন-১৩৭৩/ পৃ. - ২১১
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৩
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২৮৮
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৩০১
৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) / বিশ্বভারতী;কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২২৮

"পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ ।"[১]-- (দুঃখের পার)

বর্ষার ভারাক্রান্ত জলের মধ্যে কোন রোমান্টিকতা খুঁজে পাননি যতীন্দ্রনাথ । বরং তিনি শ্রাবণের বৃষ্টিতে মানুষকে কষ্ট পেতে দেখেছেন । 'পরের চাষা', 'চাষার বেগার', 'ছাতার কথা' -- এসব কবিতাতে বর্ষার ক্লেশকর রূপের বর্ণনা করেছেন ।-- "উপর্ঝরণ দারুণ বাদলে / ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়ে খান, / মোড়লের ঝি ভাবছে অধোমুখে / বাঁচাবে কিসে ছেলে দুটির প্রাণ ।"[২]

'মরীচিকা' কাব্যের 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায় শীতকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন "শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ ছেঁড়া কাঁথাখানা কই ।"[৩] অথবা সমস্ত ঋতুর সৌন্দর্য্য প্রেমী কবিদেরকে ব্যঙ্গ করে লেখা --- 'ফাল্গুনে হেরি নব কিশলয় যারা আনন্দে ভাসে, /শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ পাতার কাহিনী না মনে আসে ।।"[৪] প্রকৃতির মিথ্যা রঙিন সুখ দেখে ব্যথিত কবি চিত্ত বলে উঠেছে -- / "খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য, / ষড় ঋতু ছলে ষড় রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য্য ।"[৫]-- (সুখবাদী)

'সায়ম' কাব্য থেকে কবির প্রকৃতি চেতনা নব পথে চালিত হয়েছে । সেখানে কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যময় রূপকে উপেক্ষা করেননি । ষড় ঋতুর আর্বিভাবে ও অবসানে কবি খুঁজেছেন রূপের মধ্যে অরূপের জগৎ । ব্যথিত কবি মন 'সায়ম'-এ এসে বলেছেন -- "নবযৌবন সবে, / বসন্ত ছাড়ি যোগ দিয়েছিনু নিদাঘ মহোৎসবে"[৬] -- (চিরবৈশাখ)। 'চিরবৈশাখ' ও 'হেমন্ত সন্ধ্যায়' কবিতা দুটিতে তিনি সুন্দরের আহবান করেছেন । 'বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি, / বর্ষায় মেঘে মেঘে আহবান, / হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায় / কোন সুন্দরে করি সন্ধান ! -- / হেমন্ত সন্ধ্যায় বন্ধু !"[৭]-- (হেমন্ত সন্ধ্যায় / ত্রিযামা) হেমন্ত সন্ধ্যার মাঠে মাঠে সৌন্দর্য পিপাসু কবিমন ছুটে গেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পেতে কবি আত্মহারা হয়ে গেছেন ---

'রূপনদী তীরে তারি নিরাশার
আশ্বাসে বেলা কাটে,
বকুল গন্ধে ভরা গোশূন্য
বকুলতলীর ঘাটে ।"[৮] --- (বকুল তলীর ঘাটে / ত্রিযামা)

তিনি প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশে ঋতুকে সঙ্গী করেছেন বেশ কয়েকটি কবিতায় । শ্রাবণের মায়াময় চিত্র এঁকেছেন অসাধারণভাবে --- "শাওনগাঙের ভাঙন বেয়ে / ঘটভরি কাঁখে / কোন বিজলী ডেকে গেল / ঘোমটারি ফাঁকে ।"[৯] --- (শাওনিয়া)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কখনও কখনও তাঁর প্রেম-স্নেহ বঞ্চি ত দগ্ধ হৃদয়কে নিঃশেষ করতে চেয়েছেন

---

১. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;যতীন্দ্রনাথ কাব্য সম্ভার / মিত্র ও ঘোষ;কলিকাতা-১২ / প্রথম প্রকাশ আশ্বিন-১৩৭৩/ পৃ. - ১৭৫
২. তদেব ;পৃ. - ৭৪
৩. তদেব ;পৃ. - ৭৪
৪. তদেব ;পৃ. - ৭৭
৫. তদেব ;পৃ. - ২২১
৬. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত;যতীন্দ্রনাথ কাব্য সম্ভার / মিত্র ও ঘোষ;কলিকাতা-১২ / প্রথম প্রকাশ আশ্বিন-১৩৭৩/ পৃ. - ২৯২
৭. তদেব ;পৃ. - ৩৮৪
৮. তদেব ;পৃ. - ৪৩১
৯. তদেব ;পৃ. - ২৪৭

। খরতেজী চির বৈশাখে এই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করেছেন কবি ---

"মোর অন্তর প্রান্তরে বসি কাঁকরে গুনেছি দিন ।
কবে আসিবে সে চির বৈশাখ কালবৈশাখীর হীন ।"[১] -- (চিরবৈশাখ / সায়ম)

কখনো কখনো তিনি হৃদয়ের বেদনাকে তুলে ধরেছেন শ্রাবণের বর্ষণের ধারায় । বর্ষণমুখর শ্রাবণ রাতে কবির চোখে নেমেছে ঘুমের ঘোর । ঘুমের ঘোরে কবি খুঁজেছেন তাঁর সঙ্গীকে, --- "শ্রাবণ রজনী হল সে নিঝুম, / ঘিরে আসে যত ফিরে যাওয়া ঘুম, / বাদল হাওয়ায় রাখা নাহি যায় / তোমার সন্ধ্যা বাতি । / ঘনায় নয়ান শাওনিয়া ঘোর / হে মোর ঘুমের সাথী ।"[২] --- (ঘুমের সাথী)

বসন্ত সুখের ঋতু -- এমন অনুভব পূর্ববর্তী পর্যায়ের কাব্যগুলিতে লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি যৌবন-প্রেম-সুন্দর সবকিছুর প্রতি অনীহা প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন । আজ কবির জীবন থেকে যৌবন গত হয়েছে। বসন্তের মধুরতা চলে গেছে । জীবনের শেষে উপনীত কবি ব্যাকুল হয়েছেন এইজন্য যে, যৌবনে কবি কোন দিন পরাণপ্রিয়ার সঙ্গে প্রেম বিনিময় করতে পারলেন না । আজ সেই কবি আক্ষেপ করে বেদনার গান গেয়েছেন ---

"কবি আর তার পরাণ প্রিয়ার
মিলনের ব্যবধান
ফাগুদের ফুলের শাওনের কুলে
গাঁথে বেদনার গান ।"[৩] -- (চোখাচোখি)

নজরুলের রোমান্টিক কবিমন নিয়ে মিলন-বিরহের অনুভূতি তরঙ্গে ষড় ঋতুর বিচিত্রলীলা দর্শন করেছেন । ব্যাকুল কবি তাঁর প্রেয়সীকে মিলিয়ে দেখেছেন ঋতুলীলার সঙ্গে । কখনো বা সিন্ধু তরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস দেখে কবির হৃদয় প্রেমে ব্যাকুল বিহবল হয়ে উঠেছে । কখনও কবি অনুভব করেছেন -- "তুমি কাঁদ আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল । / কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত / নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত । / নিখিল বিরহী কাঁদে, সিন্ধু তব সাথে ।" [৪]-- (সিন্ধু / সিন্ধু হিন্দোল) 'সর্বহারা'তে সিন্ধু প্রসঙ্গে কবি বাদল দিনের ছবি এঁকেছেন । যেখানে সবহারিয়ে কন্যাদের চোখে যেন অশ্রুর বন্যাধারা নেমে এসেছে । তাদের আশ্রয় এখন একমাত্র সাগর কোল ---

"হাঁকছে বাদল, ঘিরি ঘিরি
নাচছে সিন্ধু জল
চলরে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল ।"[৫]

নজরুলের বিদ্রোহী সত্তাও 'শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা'[৬]র মতো দুর্দমনীয় । বর্ষার পটভূমিতেই তাঁর গোপন প্রিয়া কবির কাছে এসে ধরা দেয় । কবি মনে করেন তাঁর গোপন প্রিয়া বর্ষার কেতকীর সঙ্গে ঝরে পড়েছে --- 'বর্ষা ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি / ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী / মনের মনে নিশীথ রাতে / চুম দেবেকি কল্পনাতে ?"[৭] --- (গোপন প্রিয়া / সিন্ধু হিন্দোল)

---

১. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; যতীন্দ্রনাথ কাব্য সম্ভার / মিত্র ও ঘোষ; কলিকাতা-১২ / প্রথম প্রকাশ আশ্বিন-১৩৭৩/ পৃ. - ২৯২
২. তদেব ; পৃ. - ৩৩৩
৩. তদেব ; পৃ. - ৫১৯
৪. নজরুল ইসলাম ঃ সঞ্চি তা / ডি এম লাইব্রেরী ঃ কলকাতা ৬ / ৪৮ তম সংস্করণ ঃ ১৯৯৭ / পৃষ্ঠা ১২০
৫. তদেব ; পৃ. - ১২৬
৬. তদেব ; পৃ. - ১২৯
৭. তদেব ; পৃ. - ১২৯

দেশাত্মবোধক উপলব্ধিতেও বর্ষার ভাবনা এসেছে নজরুলের মনে । বর্ষার মতো প্রাণোচ্ছল কবির মন । বর্ষার সতেজতায় কবি যেমন পেয়েছেন রাখী বন্ধনের সোৎসাহ, তেমনি বর্ষার বিদায়বেলাতে কবি চিত্ত একেবারে দুঃখে নিমগ্ন হয়ে পড়েছে । আবার কখনও কবি বর্ষাকে 'বাদলের পরী' বলে সম্বোধন করেছেন । কবির চোখে তখন রূপকথার রূপসী কন্যার মতোই বর্ষা অপরূপা । কবি আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষার বিদায় দিয়েছেন তাঁর কবিতায় । বর্ষার বিদায় লগ্নে কবির সাথে ভাদরের নদীও সমব্যথী হয়েছে । --

"তুমি চলে যাবে দূরে
ভাদরের নদী দুকূল-ছাপায়ে কাঁদে ছল ছল সুরে ।"[১] -- (বর্ষাবিদায় / চক্রবাক)

'রাখীবন্ধন' কবিতাতে রয়েছে শরতের স্নিগ্ধ প্রকৃতি । বর্ষা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শরৎ প্রকৃতির কোলে ফুটে উঠে কাশফুল । শিউলি ঝরে পড়ে মাটির উপর । তারপর শরতের যাওয়ার সময় হয় । এমনি করে হেমন্ত আসে, হেমন্তের বিদায় আসন্ন হয় । ঋতু বিদায়ে কবির হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে --- "না ফুরাতে শরতে বিদায় শেফালি, / না নিবিতে আশ্বিনের কমল দীপালি, / তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা ঝরাগান / ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায় আহবান ।" প্রকৃতির কালচক্রে ঋতুর আসা-যাওয়া নিরন্তর ঘটছে । ঝরঝর কামিনী, শিশির ঝরা রাত্রি প্রকৃতিতে একটি ঋতুতে আসে, আবার ঋতু অতিক্রান্ত হলে এক সময় চলে যায় । আশ্বিনের সজল শিশিরের মতো দারিদ্র্য কবিকে বেদনা দেয় । হৃদয় ছলছল করে । হেমন্তের প্রকৃতি কবিকে মুগ্ধ করে । --"হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত !
কিরণ ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য-আলো সরিৎ !"[২] --
(অঘ্রাণের সওগাত /জিঞ্জীর)

আমরা জানি, হেমন্তকে ছুঁয়েই শীতের আগমন । "একবছরের শান্তি পথের, কালের আয়ুক্ষয় / পাকাধানের বিদায় ঋতু, নতুন আসার ভয় / পউষ এলো গো !"[৩] (পউষ / দোলন চাঁপা) দীর্ঘ শীতরাত্রি কাটানোর পর কবি পেয়েছেন ঋতুরাজ বসন্তকে । বসন্তের গলায় 'হারমানা হার' নজরুল পরিয়েছেন। "হে বসন্তের রাজা আমার /নাও এসে মোর হার মানা হার "[৪] -- ঠিক রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পরানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন -- "হার মানা হার পরাব তোমার গলে ।"

মোহিতলাল মজুমদার মানবের প্রেম ও প্রকৃতির ফুল নিয়ে তাঁর কাব্যের সাধনা করেছেন । ঋতুর সংস্পর্শে এসে তাঁর কাব্যে প্রেম ও ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে । বছরের পর বছর চলে যায়, ঋতুও অতিক্রান্ত হয়, আবার ফিসে আসে । ঋতুর প্রভাবে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । কবি দেখেছেন --

'বছরের পরে বছর ঘুরে গেল
একে একে তিনটি কেমন করে,
চৈত্র শেষে বোশেখ ফিরে এল
বনের রাঙা শিমূল গেল ঝরে ।"[৫] --- (প্রেম ও ফুল / স্মরগরল)

নারী প্রেম প্রাপ্তির জন্য কবি গেয়েছেন ভজনগান । চৈত্রের আগুন খেলায় তিনি খুঁজেছেন চাঁপা ফুল । চৈত্রমাসের শেষে কবি নিয়ে আসেন লক্ষ্মীকে । কাব্যলক্ষীর পরনে রক্তচেলী । ফাগুন মাস, বসন্তের দিনে লক্ষীকে সঙ্গে পেয়ে প্রেমবিবশ কবির মনে হয়েছে -- 'বসন্তেরি ফুল / ফুটবে সারা বছর ! / অমানিশা ও ভুল / নিত্যি চাঁদের বাসর ।'[৬]-- (প্রেম ও ফুল)

---

১. নজরুল ইসলাম ঃ সঞ্চি তা / ডি এম লাইব্রেরী ঃ কলকাতা ৬ / ৪৮ তম সংস্করণ ঃ ১৯৯৭ / পৃষ্ঠা ২২২
২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৭
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০
৫. মোহিতলাল মজুমদার ঃ স্মরগরল / করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ / প্রথম করুণা প্রকাশ ২০০৭ / পৃষ্ঠা ৭৫
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৪

'শ্রাবণ শর্বরী' কবিতায় প্রেমের বিরহ চিত্র তিনি এঁকেছেন । বর্ষার মিলন মধুর আবহ প্রেমের অনুভূতিকে তীব্র করে তোলে । মিলনোৎকণ্ঠায় প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে। ---

"কত আঁখি অশ্রুজলে ঝরিয়াছে শ্রাবণ শর্বরী —
প্রিয়াহারা বিরহী সে, বারিধারে হৃদয় বিধুর !
কত রাধা বায়ুরবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী,
নিশীথের নীলাঞ্জনা আঁকিয়াছে বদন বধূর ।"[১]-- (শ্রাবণ শর্বরী)

কবি তাঁর অন্তরচারিণী প্রিয়াকে বর্ষার পটভূমিতে অনুভব করেছেন । কবির সুখানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এভাবে -- 'বরষা আসারে ভরসা-সুখ, সে মুখ আমার ভরেছে বুক ।'[২] (মিলনোৎকণ্ঠা) -- শ্রাবণ রাতের জ্যোৎস্নাকাশে একলা কবি দেখেছেন -- 'পূর্ণিমারই প্লাবন, তবু - জ্যোৎস্না শ্রাবণ রাতি !'[৩] -- (নতুন আলো)। মোহিতলালের 'নির্বাণ' কবিতায় একাধিক ঋতুর সমাবেশের চিত্র রয়েছে । বৈশাখের ঝটিকা, বর্ষার অঝোর জলধারা, সোনারঙের শরৎ, দীর্ঘ শীতরাত, ফাগুনের ফুলদোল - এ সব বিচিত্র দৃশ্য 'নির্বাণ' কবিতায় রয়েছে । বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে কৃষ্ণা অষ্টমীর ভাদ্ররাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কালে কালে ভক্তরা ভাদ্র রাতের এই দিনে জাগরণ করে । পৌরাণিক আবহে রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় ভক্তরা লক্ষ্মীর আরাধনায় নিদ্রাহারা হয়েছে। প্রকৃতির ঋতুচক্রের আবর্তনে কবি কমলাসনার অর্চনা করেছেন, --

'হেমন্তের মায়ামৃগ স্বর্ণ মরীচিকা
ধায় আজো শস্যশীর্ষে, চম্পকে অশোকে
বসন্ত বিদায় মাগে, আজো মালবিকা
চেয়ে থাকে অনিমিখ নব মেঘালোকে --
.....
শরতের পীত রৌদ্রে দীর্ঘ জ্বরজ্বালা !
কে গাঁথিবে তরুমূলে শেফালীর মালা
অর্চিবে কমল তুলি কমলাসনায়।'[৪] -- (বঙ্গলক্ষ্মী)

বৈরাগ্যের ধূসরতা আজ কবি জীবনকে ছেয়ে ফেলেছে । কবির জীবন থেকে বাসনা কামনার উত্তাপ অপসৃত হয়েছে। কবি জীবনের অস্ত কিনারে নতুন আলোকে জ্বলে উঠেছেন। যৌবনের সাথীদের কবি আজ বিদায় জানিয়েছেন । বরণ করেছেন হেমন্ত সন্ধ্যার শান্ত অনুভূতিকে -- 'বরিষার শেষে শীতল আজি এ ভূমি / উদিবে এখনই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা / হিমনিষিক্ত ধরণীর মুখ চুমি ।'[৫] -- (নাম কবিতা / হেমন্ত গোধূলি)

বসন্ত মোহিতলালের কবিতায় আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । ফাল্গুনের দোল পূর্ণিমায় রাধাশ্যামের প্রেমলীলা ঘটেছে । পল্লীর পথে পথে উঠেছে প্রমোদ লহরী । যুবজন, জনপদ মেতেছে প্রেমের উৎসবে । বসন্তের বিদায়ের সময় আসন্ন হয়েছে । ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায় বসন্তের বিদায়ধবনি বেজে উঠেছে । কিন্তু জীবন, যৌবনে সমস্ত প্রেমের মিলনোৎসব এখনও পূর্ণ হয়নি । তাই কবির হৃদয়ে প্রেম ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে । আমার "সকল কামনা ফোটেনি এখনো -- ফোটেনি গানের শাখে, / চৈত্র নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে ।"[৬] -- (বসন্ত বিদায়)

---

১. মোহিতলাল মজুমদার ঃ স্মরগরল / করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ / প্রথম করুণা প্রকাশ ২০০৭ / পৃষ্ঠা ১০৮
২. তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১২২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১০৯
৫. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ/দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা ৭৩/দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৬৯
৬. মোহিতলাল মজুমদার ঃ স্মরগরল / করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ / প্রথম করুণা প্রকাশ ২০০৭ / পৃষ্ঠা ৩২

মোহিতলাল মজুমদার শরতের স্নিগ্ধ রূপকে কয়েকটি কবিতায় চিত্রন করেছেন । 'মাধবী', 'কন্যা শরৎ', 'শিউলির বিয়ে' -- এসব কবিতায় শরৎ প্রকৃতিকে নানারূপে দৃশ্যায়িত করেছেন। কবির বর্ণনায় শরতের রবিরশ্মি যেন তপ্ত সোনার মতো । এ সময় নীল আকাশে সারাদিন চলে মেঘের আনাগোনা । 'শরতের রবির প্রহরে প্রহরে ঢেলেছে তপ্ত সোনা / নীলের পাথরে শাদা মেঘেদের সারাদিন আনাগোনা;'[১] (মাধবী / বিস্মরণী)। শরতে বকুল, দোপাটি, মাধবী এসব ফুলের সমারোহ পড়ে যায়। শরতের আলো ছায়া, শরতের রামধনু -- এসব অপরূপ দৃশ্যে কবি হৃদয় আত্মহারা হয়ে পড়েছে । ঋতুপ্রেমী কবি শরতকে কন্যারূপে দেখেছেন । কন্যা শরৎ সজ্জিত হয়েছে প্রকৃতির ফুলরাশিতে খোঁপায় পরিয়েছেন শিউলিফুলের মালা এবং কল্কা ফুলের সোনার অলঙ্কারে তার গাত্র ভূষিত করেছেন। আর পরেছে সে-- "দোপাটি ফুল -- চুটকি পায়ের / সন্ধ্যামণির নাকছবি, / গোট পরেছে অপরাজিতার, / কুন্দকলির সাতনরী হার, / আঁচল খুঁটে রিংটি ভরা / কৃষ্ণকলির লাখ চাবি !"[২] (কন্যা শরৎ / বিস্মরণী)

বসন্তের আগমনী গেয়েছেন বহুকবি। কবি মোহিতলাল মজুমদার 'বসন্ত আগমনী' কবিতা লিখেছেন তিনি বসন্ত ঋতুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, কুহেলি প্রাতে যাই যাই করে শীত একসময় বিদায় নেয়। পঞ্চ মী চাঁদ সাথে সন্ধ্যায় কবির কাছে উপনীত হয়েছে বসন্ত। ধরণীর বরণীয় ঋতু বসন্ত। তিনি দেখেছেন বসন্তের গায়ে পরাগের উত্তরীয় দক্ষিণ বাতাসে উড়ে বেড়ায়। বসন্তের কোকিল, মৌমাছি ও ফুলেরা মুখরিত করে তোলে দশদিককে। গানে ও গন্ধে মাতাল হয়ে ওঠে বসন্তের বাতাস। কবি মোহিতলাল সারা দিন ধরে বসন্ত আগমনী গেয়ে চলেন। বসন্তের অরুণের তরুণ বদন এবং তরুণের আলো পল্লবের মুখে চুম্বন দিয়ে যায়। মধুভরা ফুলঝুরি পৃথিবীতে সৌরভ বিলায়। আমের মুকুল বনস্থলীকে নেশায় মাতিয়ে দেয়। গ্রামের পথে পথে ঝরে পড়ে সজিনার ফুল। বাঙালীরা ঘরে ঘরে আল্পনা এঁকে বসন্তশ্রী-পঞ্চ মীর আবাহন গীতি গায় সুমধুর সুরে। কাননে নানা পাখিরা শিস দেয়, ধান্যবিহীন ক্ষেতে যবের শীষ ফলে ওঠে। আকাশে স্তব্ধতা গভীর নিথর সলিলের রূপ ধারণ করে। পৃথবীতে প্রিয়-প্রিয়ারা দুটি নীল ফুল সম আঁখিতে মনের ভুলে স্বপ্ন দেখে যায়। পথের বালকেরা বাসকবৃন্ত চুষে হেসে হেসে মধু পান করে। মাঠ-ঘাট জ্যোৎস্নায়, দক্ষিণা বাতাসে, নেবুমঞ্জরীর সুগন্ধে মধুময় হয়ে ওঠে পরিবেশ। এমনভাবেই কবি মহিতলাল মনোহরকারী বসন্ত ঋতুর গান রচনা করেছেন, —

"মরমের কথা কহেনি যেজন, আজিকে কহিবে যে সে,
কঠিন হৃদয় আজিকে হইবে কৃতার্থ ভালোবেসে!
মনে হল আজ জীবনের যত নিরাশার পরাভব,
রঙীন এ রাতি, বাসনার বাতি যত আছে জ্বালো সব!
তৃণভূমি পরে বসিয়া ক্ষণেক হেরিলাম নিশানাথে,
বুঝিনু আবার বসন্ত এল পঞ্চ মী-চাঁদ সাথে!"[৩] (বসন্ত আগমনী/মোহিতলাল)

আরেকটি কবিতায় বৃষ্টি মুখর রাতে কবি বাঁশীর গান শুনেছেন । বাঁশীর সুরের ছন্দের মতো গাছে পাতায় ঘরের ছাতে যেন ঝরে পড়ছে বৃষ্টিধারা । কবি সেই বাদল রাতে বিছানাতে নিদ্রাহারা হয়ে শুয়ে আছেন । দুপুর রাতে প্রাণের মাঝে বাঁশীর গানের সুরের সঙ্গে হারানো-দিনের স্বপ্ন কবির মনে জেগে উঠেছে । হঠাৎ কবি বাদলের ধারায় বাঁশীর সাথে কোকিলের মধুর সুর অনুভব করেছেন । অনুভব করেছেন বাদল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঠেছে । কবির চোখের উপর পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো। সেই আলো ছায়া

১. কথাকলি সেনগুপ্ত ঃ মোহিতলাল; কবিতা পাঠ / পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯ / প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৭
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮
৩. শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখর ঃ মাধুকরী / ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ঃ কলিকাতা - ১২ / প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৯ / পৃ. - ১৬৮

মাখা পথে দেখেছেন এক তরুণীকে, ---

"সেই সে পথে এক তরুণী
(এখনো তার কাঁকন শুনি)
ভরতে আসে কলসটিরে
হাসির গাঙে, সুখের নীরে
.....
বাদল মেঘের অশ্রু জলে
দেখেছি যে তার কুম্ভ ভরা ।
বাজায় বাশী বাদল রাতে
বৃষ্টি ধারার সাথে সাথে !"[১]--- (বাদল রাতের গান / বিস্মরণী)

বাদল রাতের রোমান্টিক দৃশ্যে কবি দেখেছেন বৃষ্টি ধারার মধ্যে এক তরুণী গান করছে । কালো চোখে সেই তরুণী অপলক দৃষ্টিতে কবির দিকে চেয়ে আছে । কবি বলেছেন এই বৃষ্টিমুখর রাত ছিল অন্যরকম, — "বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে, / গাছের মাথায় বাতাস মাতে, / গভীর দুপুর বাদল রাতে । / আলো কাঁপে, ছায়া নড়ে -- / দেখছি শুয়ে বিছানাতে । / বাঁশী বাজে, বৃষ্টি পড়ে / গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে"[২] -- (বাদল রাতের গান)। কবি অক্ষয় বড়াল বর্ষা ঋতুকে 'শ্রাবণে' কবিতায় এঁকেছেন এভাবে ---

'গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে তরুগুলি হেলে দোলে
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি,
পাখিগুলি ভিজিছে বসিয়া ।" ---- (শ্রাবণে)

জলভরা কালো মেঘে ঢেকে রয়েছে আকাশ । চারিদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই, নিস্তব্ধ, নীরব, জনশূন্য । ফড়িং, ভেক, চাতকেরা যেন নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন । ভিজে ঘাসের উপর ফড়িং লাফাচ্ছে । ভেকের দল 'জলায়' অবস্থান করছে । চাতক পাখি নীড় ছেড়ে আকাশের বুকে উড়ে চলছে। ডাহুক ডাহুকী পাশাপাশি বিচরণ করছে । আর চাষী, --- "ক্বচ্চিৎ অশ্বত্থ তলে ভিজিছে একটা গাভী / টোকা মাথে যায় কোন চাষী, / ক্বচ্চিৎ মেঘের কোলে মুমূর্ষুর হাসিসম / চমকিছে বিজলীর হাসি ।" কবি একমনা হয়ে প্রকৃতির বুকে বর্ষা দেখেছেন । কবির তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নেই এবং দেহ আছে, কিন্তু মন নেই -- কবির এমনই ভাবনা বর্ষার পটভূমিতে প্রকাশ পেয়েছে । অক্ষয় কবি যেন পৌঁচেছেন সীমা থেকে অসীমের জগতে । যা রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় - 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর ।'

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতির প্রতি ও নরনারীর প্রতি গভীর প্রেম । বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা, বাঙালী ভাবনা -- এসবের সঙ্গে ঋতুচেতনা উপজীব্য হয়ে উঠেছে কুমুদরঞ্জনের কবিতায় । আমরা জানি কুমুদরঞ্জনের কাব্যের রসসৃষ্টির মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহচর্য । তিনি সচেতন কবি শিল্পী নন । তবুও তিনি গ্রীষ্ম ঋতুকালীন ফলের নজরানা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল, খ্যাতিমান, দক্ষ শিল্পীদের রচনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার যে কৌশল

১. কথাকলি সেনগুপ্ত ঃ মোহিতলাল; কবিতা পাঠ / পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯ / প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা ৬৯
২. তদেব ; পৃ. - ৬৮

নির্মান করেছেন, তা সত্যিই অভিনব । এধরনের কবিতা বাংলা সাহিত্যে প্রায় দেখা যায় না । কবিতাটি এরকম --

"মর্তমান রম্ভা এনো বঙ্কিমের উপন্যাস
দেবে ভোগে দুই কাজে লাগে,
হিঙ্গুল কমলা এনো রবীন্দ্রের কাব্য সুধা
অম্ল মিঠা যার যথা ভাগে ।
এনো যদি পানিফল গ্রীষ্মে বড় তৃপ্তিকর
'অমৃতের' নকশা মনোহর ।
আনিও সবল ইক্ষু দ্বিজেন্দ্রের কাব্যগীতি
মণ্ডা আর ডাণ্ডা একত্তর ।
এনো ভালো খরমুজা গন্ধ তার বড় মিঠা
শরতের উপন্যাস সম,
এনো কালো তরমুজ ভিতর গভীর লাল,
দেবেন্দ্রের কাব্য অনুপম ।
এনো কচি কচি আম বাউল খেপার গীতি
পেতে প্রাণ আনচান করে,
এনো নেয়াপাতি ডাব রামপ্রসাদের গান
বুক দেয় সুধা রসে ভরে ।"[১]--- (গ্রীষ্মের ভেট / মর্মবাণী)

কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বর্ষার প্রসঙ্গ বেশি লক্ষ্য করা যায় । কবি বলেছেন, বর্ষা মেঘে মেঘে দুন্দুভি বাজিয়ে আসে । বর্ষার বিজয়ধবনি ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয় । বর্ষার গৌরব প্রকাশ পায় নদনদী জলে পূর্ণ হলে, উচ্ছল স্রোতে প্রবাহিত হলে । বর্ষার সতেজতা, দুরন্ত স্বভাব বনকুসুমের সঙ্গেই বিকশিত হয় । বাংলার প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা থেকে কবি লিখেছেন --

"স্বাধীন দেশের বাদল দেখা
ছিল আমার ভাগ্যে লেখা,
মনে মনে আজকে বড় হচ্ছে অহংকার
বৃষ্টি আরও মিষ্টি লাগে,
পতনে তার ছন্দ জাগে,
চৌদিকে এই জলের ঝালর লাগছে চমৎকার ।"[২] --

(স্বাধীন বাংলার বাদল/পল্লী ও প্রকৃতি)

পাঁচটি ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতু বাংলায় আসার জন্য প্রকৃতির সাথে কবিও যেন দীর্ঘ সময় ধরে প্রতীক্ষা করে আছেন । গ্রীষ্মের ফুল ফলের দিন শেষ হয়ে এসেছে। কবি উপলব্ধি করেছেন ভাঙনের অতি কাছে বর্ষাও আসার জন্য অপেক্ষমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবির ভাষায় বর্ষা এসেছে --- "ফুল ফল শেষ -- ভাঙনের অতি কাছে, / প্রাচীন তরুটি একাকী দাঁড়ায়ে আছে । / ভরা শ্রাবণের ঘন রাঙা জল / কবে ভাসাইবে ভাবিছে কেবল, / শিকড়ের মাটি লভিতেছে শিহরণ ।"[৩] --- (অপেক্ষমান / পল্লী ও প্রকৃতি)

---

১. কুমুদরঞ্জন মল্লিক ঃ কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার / মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২ / প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪, পৃষ্ঠা ১৯
২. তদেব, পৃষ্ঠা ১১২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৫

কবি বর্ষার সৌন্দর্যকে দেখেছেন, 'কালো জামে ভরা জম্বুবৃক্ষ'তে । সেখানে 'জমাট করিয়া রেখেছে সে যেন বর্ষার সুষমাকে'[১] (পথতরু)। গৃহবদ্ধ পিঞ্জরের ভিতর বসে কবি দেখেছেন ঘন বর্ষার সমারোহ । ঘরে বসেই তিনি পেয়েছেন যুথী, মালতীর সৌরভ । কখনো কখনো রামধনুর সপ্তরঙের রেখায় বর্ষার দিনের আভাস কবি লক্ষ্য করেছেন । কেকা তার পুচ্ছের গৌরব কিভাবে ঘনবর্ষায় মেলে ধরে তাও কবি কাছে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করেছেন। এককথায় বর্ষার স্নিগ্ধ দিনগুলি কবির কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে ।

কুমুদরঞ্জনের আর একটি জনপ্রিয় কবিতা 'বাল্যবন্ধু' । এ কবিতায় তিনি বাল্যবন্ধুর স্মৃতিচারণ করেছেন । প্রত্যেক ঋতুর উপস্থিতিতে কবির মন গ্রাম্য প্রকৃতির সঙ্গে বাল্য বন্ধুর স্মৃতি চারণ করেছেন, —

"বাদলা দিনে তাদের লাগি মন করে কেমন,
শরৎ বায়ে পেয়েছিনু তাদের আলিঙ্গন ।
হেমন্তের হায় কুজ্ঝটিকায় নয়ন আমার পথ যে হারায়
তারাই করে অমৃতময় আমার এই জীবন ।"[২] -- (বাল্যবন্ধু / স্মৃতি)

কবি কুমুদরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিয়েই 'ভাবের ভুবন' কবিতাখানি লিখেছেন । এখানে তিনি বলছেন - কত কঠোর তপস্যার পর তিনি অনুসরণ করতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথকে -- 'কত শরতের পদ্মের ধ্যানে এলো রবীন্দ্রনাথ'[৩] (ভাবের ভুবন / মর্মবাণী)। দশবছর আগের স্মৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন 'কাক জ্যোৎস্না' । একবিতাতে এক আদুরী কন্যা 'সিলভিয়া'র কাহিনী লিখেছেন । 'ফাগুন প্রাতের পাপিয়ার মত মাতোয়ারা তার প্রাণটি' এবং 'শীতের গোলাপ ম্লান হয়ে যায় না হেরি' কাহার মুখটি ?'– (কাক জ্যোৎস্না / স্মৃতি)। সিলভিয়া সম্পর্কে কবির ঋতুকেন্দ্রিক চারিত্রিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে ।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'সাধনপথে' কবিতাটি শীতঋতুর পটভূমিতে লেখা । 'প্রয়াগে একদা মেঘাচ্ছন্ন মাঘের প্রাতে / ধর্মশালায় সাক্ষাৎ এক সাধুর সাথে ।' -- সেই সাধুই সব সাধনার গতিপথ সম্পর্কে বাণী শুনিয়েছেন । কিন্তু কবি তার সাধনায় পেলেন না দেবতাদের । কবির আক্ষেপ ---

"সবদর্শী সে শিব আসিল না তুষারে শীতে
সুদূর সুরভি এলো না আমার কস্তুরীতে ।"[৪] --- (সাধনপথে / ভক্তি)

সব মিলিয়ে বোঝা যায় ঋতুর উপস্থিতির জন্যই কুমুদের পল্লী প্রকৃতি এত অনিন্দ্য, এত সুন্দর । তাইতো 'পিয়াল বেণুতে গোটা বসন্ত মদিরা পিকের ডাকে'[৫] কবি মুগ্ধ হয়েছেন।

পল্লী প্রেমী কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর পল্লীকবিতাগুলি বিভিন্ন ঋতুর উপস্থিতিতে মধুময় হয়ে উঠেছে । ঋতুর অপূর্ব সৌন্দর্য্যে কবি মোহিত হয়েছেন । তাঁর প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ঋতুর উপস্থিতিতে ফুটে ওঠা ফুলগুলির কথা বলেছেন । প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে করুণানিধান লিখেছেন —"চির যুগের কান্তা আমার / প্রাণ প্রতিমা, বাঞ্ছিতা,/চিনি তোমার সিঁথির মণি/শিথিল বেণীর নীল ফিতা । /নিমন্ত্রণের পথ লিখে / পাঠিয়েছিলে এই পথিকে - / শুনব মধুর কণ্ঠ তুহার / জাগো ফাগুন-পুষ্পিতা ।"[৬] --- (দুমকারাণী / শতনরী /করুণানিধান)

করুণানিধানের প্রেম মূলক কবিতাগুলি ঋতুর সাহচর্য্য পেয়ে শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছে । লক্ষ্য করা

---

১. কুমুদরঞ্জন মল্লিক ঃ কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার / মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২ / প্রথম প্রকাশ ১৩৭৪, পৃষ্ঠা ১২৮
২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৮
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৩
৬. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ / দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা ৭৩ / দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, পৃষ্ঠা ৬০

যায়এককালে তাঁর প্রেম কবিতাগুলি যুবকণ্ঠে উচ্চারিত হত । 'শতনরী' সংকলনের এমনি একটি জনপ্রিয় কবিতাতে ঋতুর মধুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় ।-- "ফুল দিয়ে সে ভুলিয়ে দিল চুল বাঁধা । / সেদিন ছিল ফাল্গুনী বৈকাল / মন - শরদে ভালোবাসার সুর সাধা / টুটল আধেক সাজের অন্তরাল । / দখিন হাওয়ায় বুকের মাঝে জাগল বসন্ত, / চিনিয়ে দিল ফাল্গুন অচেনা পন্থ ।"[১] -- (বাসন্তী / শতনরী)

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য -- এই তিনজন কবি সমকালে সমানভাবে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন । তবে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় মূলতঃ কুমুদরঞ্জন এবং কালিদাস রায়ের চিন্তা বিস্তৃত হয়েছে । বৃন্দাবনের নিত্য বসন্ত প্রকৃতির রূপ স্পষ্ট হয়েছে এঁদের কবিতায় । কিন্তু যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের কবিতার বিষয়ের মধ্যে শুধু ঋতুর নির্মল, মধুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । ঋতু মুগ্ধ অনেক কবির মতো যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর কবিতাতে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা করেছেন । 'ঋতুসংহার'[২] কবিতায় ছয়টি ঋতু বর্ণিত হয়েছে এভাবে ---

গ্রীষ্ম

ভারী রোদ, ঝড় ঝড়
ভাঙা ডাল, মড়্ মড়্
গাছ ভরা আম জাম,
হাত পাখা, খুব ঘাম ।
ভোর বেলা নামতা,
বউঝির 'আমতা' । ---

শরৎ

খালবিল ভরপুর ।
প্রাণমন সুরসুর !
দশদিক সুন্দর ।
ফিটভাট অন্দর ।
বাপ মার বৌ ঝির
অন্তর অস্থির ।--

শীত

শিউলি ঝরণ
মধুর তপন !
সবুজ শোভা
সুনীল গগন !
রাতে শিশির
দিনে গরম !
জ্যোৎস্না নিশির
বেজায় সরম !

বর্ষা

আকাশ জোড়া মেঘ !
ভূতলভরা জল !
কদমফুল বাস !
ব্যাঙের কোলাহল !
কেমন যেন মন !
আপন যেন পর !
কিসের যেন দুখ !
আঁখির ঝর ঝর !

হেমন্ত

পাকা ধানের গন্ধ মিঠে
নানান বাড়ী নানান পিঠে
সোনায় ভরা উঠান গোলা
ভোরে পাতায় শিশির ঝোলা
শুকনো তরু, শুকনো পাতা
বুড়োবুড়ির ঢাকা মাথা ।

বসন্ত

মুহুর্মুহু, 'কুহু কুহু' !
পরাণ কাড়া উহু উহু !
নানান ফুলে ফুল্ল বন !
মধুর হাওয়া, মত্ত মন !

---

১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ / দে'জ পাবলিশিং ঃ কলকাতা ৭৩ /দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮, পৃষ্ঠা ৫৬
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ঃকবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা /যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য স্মারক সমিতি ঃ কলিকাতা ১৪, পৃষ্ঠা ৭৮

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলিতে ঋতুর বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'আর্যগাথা'র 'প্রকৃতি পূজা' অংশের কয়েকটি কবিতায় প্রকৃতিকে ঘিরে কবি হৃদয়ে এক বিরহ-বিধুর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কবি মনে করেছেন, আকাশে অবস্থিত নীহারিকা মানবের দুঃখে দুঃখী হয়েছে। তারকার অশ্রুজল যেন তারই প্রকাশ। গ্রীষ্মের তপ্ত পৃথিবীর স্নানের সুশীতল বারি হল নীহার বিন্দু। 'নীহার' কবিতাতে কবি সুন্দরভাবে লিখেছেন --

'কিম্বা তপ্তা রবিকরে, ধরার স্নানের তরে
আনে রজনী দেবী বারি সুশীতল
কিম্বা বিভু প্রেমরাশি, তরল হইয়ে আসি
সুপ্ত ধরাতল মাঝে করে ঢল ঢল ।"[১] -- (নীহার / প্রকৃতি পূজা / আর্যগাথা)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবনের দুঃসময়কে 'শীত' ঋতুর প্রেক্ষিতে প্রকাশ করেছেন। হতভাগ্য কবিতার ভাবটি এরকম-- "একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা;/ একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে / বহে শীতের প্রখর বাতাস উড়িয়ে তাঁদের ছেঁড়া কাপড়, / তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া"[২] -- (হতভাগ্য/ আলেখ্য)।

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণকে কবি তাঁর কবিতার সঙ্গী করেছেন। 'আলেখ্য' কাব্যের অন্তর্গত 'বিপত্নীক' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার মিল রয়েছে অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতায় আছে -- "এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ হিল্লোলে / পুষ্পদল চুমি,/ এবার আসনি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে / ধন্য ধন্য তুমি ।"[৩] দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিপত্নীক' কবিতার একটি অংশে দেখা যায় -- "এসেছিলে সেদিন তুমি, যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে / সুখ স্বপ্ন আসে, / এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে চামেলিগন্ধ, / বসন্ত বাতাসে ।"[৪] কবি দ্বিজেন্দ্রলাল মনে করেন, 'সকল দেশের সেরা' হল তাঁর জন্মভূমি 'বাংলাদেশ'। সত্যিই তো, যে বঙ্গদেশে ঋতু বৈচিত্র্যের অপার রহস্যের লীলা খেলা চলে -- সে দেশ তো রূপের রাণী হবেই, হবে সকল দেশের সেরা ।

বাংলা কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তবুও আমরা জানি ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য কবিতার সৃষ্টিতে কম প্রশংসনীয় নয়। তাঁর কাব্য ভাবনায় ঋতু এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৫ বছর বয়সে লেখা ঋতু বিষয়ক কবিতা হল 'হেমন্ত বর্ণনা ছলে স্ত্রীর সহিত কথোপকথন। এছাড়া অন্যান্য ঋতু বিষয়ক কবিতাগুলি হল, — "শিশির বর্ণনা ছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন', 'বসন্তের নিকট বিদায়', 'বর্ষা বর্ণনা ছলে দম্পতির রসালাপ', 'বর্ষার মানভঞ্জন' প্রভৃতি। নারীর মধ্যে ষড়ঋতুর প্রকাশ তিনি লক্ষ্য করেছেন। ---

"অপরূপ দেখ একি, শরীরে তোমার
একটাই ষড়ঋতু, করিছে বিহার ।।
নিদাঘ, বরষা আর শারদ হেমন্ত,
নিরখি শিশির আর দুরন্ত বসন্ত ।।"[৫]--- (কামিনীর প্রতি উক্তি)

---

১. রথীন্দ্রনাথ রায় ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার / বাক্ সাহিত্য ঃ কলিকাতা ৯ / তৃতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০০, পৃষ্ঠা ৭৩
২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৩
৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র) / তুলি কলম ঃ কলকাতা ৯ / নতুন সংস্করণ ২০০৪, পৃষ্ঠা ৯৭৯

তিনি বসন্ত ঋতুকে নিয়ে কৌতুক বিষয়ক প্রবন্ধ 'বসন্ত এবং বিরহ' -- (লোকরহস্য), 'বসন্তের কোকিল' (কমলাকান্তের দপ্তর) রচনা করেছেন । এসব রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মানব সমাজের অবনত দিকগুলির প্রতি কটাক্ষ করেছেন ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । বিদ্যাপতি তাঁর লেখাতে যেমন ভাব প্রকাশ করেছিলেন, বঙ্কিমের লেখাতেও সেই ধরণের ভাব লক্ষ্যনীয় ।

বিদ্যাপতি ঃ 'শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ 'সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে
রম্যবৃক্ষতলে
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
বরষার জলে ।।
বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি
রূপের প্রকাশে ।
শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদ বদনি লো
আমার আকাশে ।।
কৌমুদী মধুর হাসি, দুঃখের তিমির নাশে ।।'[২] -- (আদর)

'মেঘ' এবং 'বৃষ্টি' -- এই দুটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন । এখানে প্রত্যেকটি বৃষ্টিকণাই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে অহংকার করেছে । বৃষ্টিকণার মুখে গর্ব প্রতিম উচ্চারণ ---

> 'চল নামি - আষাঢ় আসিয়াছে - চল নামি ।.... কোন দেশের মানুষ রাখিব -- কোন দেশের মানুষ মারিব --কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব -- পৃথিবীর জলময় করিব -- অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র ! আমাদের মত ক্ষুদ্রকে ? আমাদের মত বলবান কে?"[৩]
> -- (বৃষ্টি)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিতাতে ললিতার শরীরী বর্ণনা করেছেন শরৎ ঋতুর সাহচর্য্যে । --- "বদনে ললিত রেখা কত হয়ে যায় / রক্তিম নীরদ যেন শারদ সন্ধ্যায়"[৪]-- (ললিত)। কবি বঙ্কিমচন্দ্র 'শীত' ঋতুকে 'শিশির' বলে আখ্যায়িত করেছেন । 'কামিনীর প্রতি উক্তিতে' যে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা দিয়েছেন, তা একপ্রকার ঋতুসংহার হয়ে উঠেছে । তিনি কামিনীর মধ্যেই ছয় ঋতুর অবস্থান দেখেছেন। এর নির্মাতা হলেন ঈশ্বর । -- "দেখ দেখ বিধুমুখি, ঈশ্বর কৌশল / স্থাপিত কোরেছে ঋতু, তোমাতে সকল ।।"[৫]

'বসন্তের নিকট বিদায়' কবিতাংশে বসন্ত ঋতুর মনোহর রূপের বর্ণনা করেছেন । বসন্তের বাতাস উন্মাদের মতো প্রবাহিত হয় । বিচিত্র ফুল রঙ ও সুগন্ধ নিয়ে বিকশিত হয় । বসন্ত ঋতুতেই মানবের যৌবন, প্রেমের স্পর্শের জন্য অস্থির হয় । 'বসন্তের নিকট বিদায়' নিতে গিয়ে কবি বঙ্কিমের মনে হয়েছে -- 'আসিবে বসন্ত ফিরে / ফিরে আসি ফুটাইবে ফুল।"[৬]

---

১. সুকুমার সেন সম্পাদিত ঃ বৈষ্ণব পদাবলী / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯ / পৃষ্ঠা ১০৩
২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র) / তুলি কলম ঃ কলকাতা ৯ / নতুন সংস্করণ ২০০৪, পৃষ্ঠা ৯৫২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৬২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৬২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৬২
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৬৩

দুঃখের বিষয়,-- 'কিন্তু রে কভু কি আর, আছে আশা ফিরিবার, / মানবের যৌবন বসন্ত ।"[১] তাই তিনি উপদেশ দিয়েছেন --

"তাই বলি পরিণামে অধরেতে ধরি নামে,
ঈশ্বর অন্তরে ভাবে যেই ।
পরমেশ প্রেমাস্পদ লাভ করি মোক্ষপদ
নিত্যই বসন্ত পাবে সেই ।।"[২] --- (বসন্তের নিকট বিদায়)

কামিনী ও পতির কথপোকথনে বর্ষার ঋতু রস বর্ণনা রয়েছে । বর্ষার আগমনে কামিনী অনুভব করেছে প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ । আশঙ্কিত কামিনী জিজ্ঞাসা করেছে 'বল বল প্রাণনাথ, কেন কে অকস্মাৎ/ গরজন বরিষণ হয় ।"[৩] প্রত্যুত্তরে পতি বলেছে --

"প্রাণেশ্বরি শুন শুন যে কারণে পুন পুন
গরজন বরিষণ হয় ।
অতিশয় দম্ভভরে বর্ষা আগমন করে
সঙ্গে সব সহচর হয় ।।"[৪] -- (বর্ষা বণর্নাছলে দম্পত্তির রসালাপ)

বর্ষা ঋতুর আগমনে দিন রাত প্রায়শই আকাশে মেঘ বিরাজ করে । মনোহর চাঁদকে দেখা যায় না। শোভাহীন হয় প্রকৃতি । তাই কবি বঙ্কিমচন্দ্র 'বর্ষার মানভঞ্জন' করেছেন । কবি দেখেছেন, গগনের তারা নয়ন মুদিত করে, ফলে আকাশ হয় জ্যোতিহারা । অনুক্ষণ বৃষ্টিধারা বারবার ধরাকে জলপূর্ণ করে । কোকিল মৌন হয়, কুহু কুহু কাকলী শোনা যায় না । কবি অভিমানী বর্ষার মানভঞ্জন করেছেন এইভাবে --- "মান ভাঙ্গিবার তরে, ধরিলাম দুই করে / মুখ - পদ্মে কর পদ্ম দিলে;/ বুঝি এই ভাব তার, আগমনে বরষার / কমলিনী মুদিতা সলিলে ।"[৫] --- (বর্ষার মানভঞ্জন)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন ও জগৎকে ভালোবেসে ঋতুর বৈচিত্র্যে নিহিত সৌন্দর্য ও রস চরিতার্থতার কথা বার বার বলেছেন। ঋতুর অনুভবের মাধুর্য্য দিয়ে তিনি গেঁথেছেন মানব ও প্রকৃতির সুখ-দুঃখের কাহিনী । শিশুকাল থেকেই জানলার ভেতর দিয়ে হু হু করে আসা বাতাস, অনেক দূরের পাড়াগাঁর পানবন, খই মৌরীর ক্ষেত, রঙ বেরঙের পালক, কলমী, কাঞ্চ ন নতুন দুধ, সোনামনি শরৎকালের ফুল, চারিদিককার চাঁদা কাঁটা কেয়াকাঁটাদল, রোদের থেকে মেঘের কণিকার উজ্জ্বলতা, দিগন্ত ছড়িয়ে ফাল্গুন বাতাসের হুল্লোড় -- এমন সুন্দর ঋতুর মহিমময় দৃশ্য দেখে উতলা হয়েছিল কবির মন । ষড়ঋতুর সাগরে শয্যায়িত হয়েও রবীন্দ্রনাথ শিশিরের কণাটির মত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে পৃথিবীর ঋতুরঙ্গ বলে আকর্ষণবোধ করেছেন । ঋতুর দিকে চোখ ফিরিয়ে কবির মন কত শত বার বর্ণময় হয়ে উঠেছে । গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে পৃথিবীর সকল জীব ঋতু আবর্তনের ডাক শুনে জীবনের চাওয়া পাওয়া শেষ করে ফেলে । কিন্তু অন্তহীন ঋতুর যাওয়া আসা তো থেমে থাকে না। তই অনাদি কাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত ঋতুর গুরুত্ব অপরিসীম । কালে কালে কবি সাহিত্যিকরা ঋতুর সৌন্দর্যে প্রীত, মুগ্ধ । রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নয় ।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যে মূলতঃ কবি জীবনের বিষাদ ও বেদনার ভাবকে প্রকাশ করেছেন । 'প্রভাতসঙ্গ

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র)/ তুলি কলম ঃ কলকাতা ৯ / নতুন সংস্করণ ২০০৪, পৃষ্ঠা ৯৬৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৮৫
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৮৫
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৮৫
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৯২

ীত' এ এসে কবি মানব জীবনের ও প্রকৃতির পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন । 'ছবি ও গান' এ কবি প্রাণভরে প্রকৃতি ও মানবজীবনের বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন । বাদল দিনে নির্জন ঘরে একাবসে তিনি দেখেছেন - 'টুপ্‌টুপ্‌ বৃষ্টি পড়ে, / পাতা হতে পাতায় ঝরে, / তালপুকুরে, জলে 'পরে, / বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায় ..... "[১] (ছবি ও গান)। উচ্ছ্বাস ও কল্পনার অতিশয্যে কবি 'ছবি ও গান' রচনা করেছেন । কিন্তু 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে এসে তিনি স্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বকে দেখছেন । কবির প্রবল উচ্ছ্বাস এখানে সংহত হয়েছে, স্বপ্নের আবেশ কেটে গেছে । এ প্রসঙ্গে সমালোচন বলেছেন -- "কবি 'কড়ি ও কোমল' প্রকৃতভাবে প্রকৃতি ও মানব জীবনের সম্মুখীন হইলেন । কবির মন সমস্ত স্বপ্ন কুহেলিকা হইতে মুক্ত হইয়া শরৎ আকাশের মতো সোনালী আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল । সেই নির্মল সোনালী আলোর আভায় কবি মানব জীবনকে নূতন করিয়া দেখিলেন ।"[২] সত্যিই, রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'কড়ি ও কোমলের' যুগের মনকে শরৎ - আকাশের সঙ্গে তুলনা করেছেন । বলেছেন, " -- জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে আকাশ যে আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি, তাহা শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষীদের ধানপাকানো শরৎ - সে আমার গানপাকানো শরৎ । এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব, তাহা মানুষের। 'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবন নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান । সেই রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার । ..... বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই আত্মনিবেদন । ..... আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু ও বর্ষণ । তখন এলোমেলো ছন্দ ও অস্পষ্ট বাণী । কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবল মাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে । এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানা প্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে । "[৩] (জীবনস্মৃতি)

'কড়ি ও কোমল' কাব্য থেকেই তিনি মানুষের স্পর্শলাভ করেছেন । কবির মর্মকথা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে - "মরিতে চাহিনা না আমি সুন্দর ভূবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।"[৪] প্রকৃতি ও মানবজীবনকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসতে চেয়েছেন । প্রকৃতির রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও মানবজীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, হাসি-অশ্রু, স্নেহ-প্রেম, বিরহ-মিলন কবিকে মুগ্ধ করেছে । এই কাব্যের মধ্যে নারীর দেহচিত্রমূলক কবিতাগুলিতে এক অভিনব রূপ লক্ষ্য করা যায় । কবির চর্তুদিকের পরিবেশ নারীময় হয়েছে । ফুলের স্পর্শে তিনি রূপসী নারীর স্পর্শ অনুভব করেছেন । বসন্তের দক্ষিণা বাতাস কবির কাছে সমস্ত বিরহিনীদের দীর্ঘনিশ্বাসের মতো লেগেছে । নারীর দেহ সৌন্দর্য্যে কবি মুগ্ধ হয়েছেন । সেখানে পার্থিব বাসনা কিংবা দৈহিক লালসার কোন স্থান নেই । তিনি দেখেছেন --

"নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্তসমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল।"[৫] (কড়ি ও কোমল)

রবীন্দ্রনাথের হাতে নারী তার ক্ষণিক ভোগের রূপ ত্যাগ করে বিশ্বের জননীতে পরিণত হয়েছে । তাঁর

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১৪২
২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঃ রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী - কলিকাতা - ১২, প্রথম প্রকাশ - ১৩৬৯, পৃ. - ১৫০
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৪৪৭
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫০
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৯৮১

প্রিয়া প্রেয়সী রূপ ত্যাগ করে মাতৃরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । ক্ষণিক সৌন্দর্য চিরন্তন সৌন্দর্যে উত্তীর্ন হয়েছে । তিনি প্রিয়ার দেহ কামনা করেছেন এভাবে --- "ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি । / এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী । / শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল / টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি । / ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা, / পঞ্চ দশ বসন্তের একগাছি মালা ।"[১] (কড়ি ও কোমল)দেহের মধ্য দিয়েই তিনি দেহাতীত সৌন্দর্যে উপনীত হয়েছেন । তাই তিনি বলতে পেরেছেন -- "শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক / ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায় ।"[২] (কড়ি ও কোমল)

'কড়ি ও কোমল' এর আর এক ধারার কবিতায় বিষাদ ও নৈরাশ্যের ভাব দেখা যায় । কবির ভ্রাতৃজায়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের বিকাশের যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, এই স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া কাদম্বরী দেবী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী । তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হন । কিছুকাল পরে তিনি এই শোকের ভাব কাটিয়ে উঠে পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আহবান করেছেন । কাব্যে আবার উঠেছে বসন্তের বাতাস । "হেথা হতে যাও পুরাতন ! / হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে ! / আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি, / বসন্তের বাতাস বয়েছে । / আয়রে নূতন আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয় তোর সুখ, তোর হাসি গান ! "[৩] (কড়ি ও কোমল)

শিশুজীবনের যে রহস্য ও মাধুর্য তা ব্যক্ত হয়েছে 'শিশু', 'শিশু-ভোলানাথ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে । এখানে থাকা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল আকর্ষণীয় । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -- " বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান" এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহ মন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো ভুলিতে পারি নাই । ..... এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূত ছিল ।"[৪] (লোকসাহিত্য)

'মানসী' তে রবীন্দ্রনাথের কবি কর্ম প্রকৃত শিল্প মর্যাদা লাভ করেছে । নারী সৌন্দর্য ও প্রেমের জয়গানে 'কড়ি ও কোমল' ছিল মুখর । মানসীতে সেই প্রেম কামনার সংকীর্ণতা ও ক্ষণিকতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে । পল্লীবালিকা সময়ের সিঁড়ি বেয়ে বধূতে উত্তীর্ন হয়েছে । বধূ পিতৃগৃহে নগ্ন পল্লীপ্রকৃতির কোলে সহজ, সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতো । বিয়ের পর সে শহরে শ্বশুর ঘর করতে আসলো । কৃত্রিমতাপূর্ণ নতুন পরিবেশ বধূর কাছে হৃদয়হীন ও বেদনাদায়ক মনে হল । সমবেদনাহীন অনভ্যস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দিনী বধূর মনে পুরাতন স্মৃতি জেগে উঠলো ।

"অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি ।
শরতে ধরাতল শিশির ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি ।"[৫] (বধূ / মানসী)

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের প্রাণে যে ভাবাবেগ তরঙ্গায়িত করেছে, তাই মানসীতে ব্যক্ত হয়েছে । প্রকৃতির বিচিত্র রূপ । ষড়ঋতুর লীলা বৈচিত্র্য চিরকালই কবিহৃদয়কে মুগ্ধ করেছে । বর্ষাঋতুর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য তাঁর মর্ম্মের চিরন্তন বিরহবাণী । তাঁর কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট অংশ বর্ষা ঋতু । বর্ষাকে নিয়ে

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১৮৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৩
৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫০
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৩৫২
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২৫০

তিনি বহু গান ও কবিতা লিখেছেন । রবীন্দ্রনাথের বর্ষা ঋতু চেতনার উপর কালিদাস ও বৈষ্ণব পদাবলীর যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায় । বর্ষা সম্বন্ধে তাঁর গানও কবিতা মেঘদূতের যক্ষ -যক্ষিনীর ও রাধিকার বিরহে পর্যবসিত হয়েছে। বর্ষাকে ঘিরে তাঁর কাব্যের রমণীয়তা শতগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে । 'একাল ও সেকাল', 'বর্ষার দিনে', 'আকাঙ্খা', 'মেঘদূত'- বর্ষা ঋতুকে অবলম্বন করে লেখা । 'কুহুধবনি' বসন্তের ভাববাণী, 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'প্রকৃতির প্রতি', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' এ কবিতাগুলিতে প্রকৃতির রুদ্র ও রহস্যময় ভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

'একাল ও সেকাল' কবিতার কবি বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ ও সজল ছায়াচ্ছন্ন দিক চক্রবাল নিরীক্ষণ করেছেন। এরই মধ্যে দেখেছেন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার দিনে রাধিকার প্রাণে উথলে উঠা অসহ্য বিরহ বেদনা । রবীন্দ্রনাথের রাধা দিবাভাগেই প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে অভিসার করেছেন । বর্ষা সমাগমে যে সমস্ত প্রণয়ীরা প্রবাস থেকে ঘরে ফিরেছে, তাদের প্রণয়িনীরা প্রতীক্ষায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আছে । কোনো প্রতিবেশীর মেঘমল্লার রাগে বর্ষার অর্ন্তনিহিত বিরহ যেন নির্দয় তীরের মতো তাদের বুকে বিঁধছে । কবি কল্পনার চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে অলকাপুরীর সেই বিরহিনী যক্ষপত্নীর চিত্র । রবীন্দ্রনাথের কাছে বৈষ্ণবপদাবলীর রাধাকৃষ্ণ ও কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষপত্নীর প্রেম ও বিরহ - বেদনার চিরন্তন প্রতীক হয়েছে । শরতের পূর্ণিমা রজনীতে ও শ্রাবণ-রাত্রির ঘনবর্ষণে এখনো মানবহৃদয় যেন বিরহ বেদনায় মথিত হয়ে ওঠে।

'আকাঙ্খা' কবিতায় দেখা যায়, ঘননীল আকাশে মেঘ ঢেকে গেছে । পূবদিক থেকে দমকা হাওয়া বইছে -- বর্ষাঋতুর এই উজ্জ্বলতার দিনে কবি ভাবছেন, 'আজ সে কোথায়'? এতদিন সে কাছে ছিল, তবুও হৃদয়ের বাণী তাকে বলা হয় নি । তাঁর -- "মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে, / বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে ।"[১]

বর্ষণমুখর দিনে নরনারীর হৃদয় প্রেম - নিবেদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে । বর্ষায় মানুষের মন অকারণ বেদনায় ভরে উঠে । মনে হয় কে যেন নেই, কাকে যেন হারিয়েছি, কার অভাবে যেন মন আকুল হয়ে উঠেছে । ষড় ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে মানুষের মনের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে । এক এক ঋতুর আর্বিভাবে পৃথিবীর যে রূপবৈচিত্র্য ফুটে উঠে, তা মানুষের মনে বিচিত্র ভাব সৃষ্টি করে । বর্ষা ঋতুর অরিবল বারিধারা যেন প্রকৃতির বুকফাটা কান্নার প্রতীক । বর্ষাতে মানুষের মনেও একরম আর্তি প্রকাশ পায় । এ আর্তি যেন কাউকে একান্ত আপন করে পাওয়ার আশা করে । রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনে নরনারীর হৃদয়ে বিচিত্রভাবে প্রেমের জাগরণ ঘটে --

> "নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে — তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল-স্থল - আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায় । যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য-শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চ ল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে । পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে, এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামন্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয় । এক একটি ঋতু যখন আপন

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২২৬

আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না । সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ় স্পর্শাধীন । সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন -- তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম - জাগানো, ফুল ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক ।"[১] (কেকাধবনি, বিচিত্র প্রবন্ধ)

যে কথা জীবনে অব্যক্ত থেকে গেল, দৈনন্দিন কর্ম কোলাহলের ভেতর চাপা পড়ে গেল, তাই ঘন বর্ষার নিভৃত ছায়ালোকে বসে বলা যায় । কবির কথায় --

"যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় ।"[২]

শুধু কবিতায় নয়, উপন্যাসেও এই অব্যক্ত প্রেম উজাড় হয়েছে। বাদল মুখর দিনে কবিমন আত্মহারা হয়েছে। 'শেষের কবিতা'য় কবি বৃষ্টির দিনে লাবণ্যের মনোভাব বিশ্লেষণ করে বলেছেন --

'দুর্দান্ত বৃষ্টি ..... লাবণ্যের মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল, -- যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতের দুই হাত চেপে ধলে বলে উঠি -- জন্মে জন্মান্তরে আমি তোমার । আজ বলা সহজ । আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হূ হূ করে কী যে হেঁকে উঠেছে তার ঠিক নেই, তারি ভাষায় আজ বন - বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টি ধারায় আবিষ্ট জগৎ আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে।"[৩] (শেষের কবিতা)

রবীন্দ্রনাথ এক মেঘাচ্ছন্ন ধারা বর্ষণমুখর অপরাহ্নে মেঘদূত পড়ছেন, আর কল্পনার রথে চড়ে কালিদাসের সঙ্গে তাঁর সকল চিত্রের শোভা উপভোগ করেছেন । এই বঙ্গদেশের নববর্ষার ছবি দিয়ে কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের সূচনা করেছিলেন ।

"আষাঢ়ের মেঘ প্রতিবৎসর যখনই আসে, তখনই নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে । .....মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয় । কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রসাদ শিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি, ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই ।.... প্রকৃতির সাংবাৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে । "[৪] (নববর্ষা /বিচিত্র প্রবন্ধ)

রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে 'মেঘদূতে'র অর্ন্তনিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন । তাঁর প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত'

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৬৮৩
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩০৩
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৪৬৯
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৬৮৯

প্রবন্ধে, 'লিপিকা'র মধ্যে 'মেঘদূত' গদ্যকাব্যে, 'পুনশ্চে'র মধ্যে 'বিচ্ছেদ' নামক গদ্য কবিতায় মেঘদূতের তত্ত্বের ইঙ্গিত ও বর্ষাস্নিগ্ধ পটভূমি আছে ।

ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির বেশ পরিবর্তন হয়, রূপ বৈচিত্র্য ঘটে । বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে বিভিন্ন ফুল, পাখি, বন ও গন্ধ মানুষের মন ও কল্পনাকে আবিষ্ট করে । বর্ষায় কদম্ব ও কেতকী ফুল, ময়ূরের কেকাধবনি, শরতের শুভ্র কাশফুল ও হংসরব, বসন্তে অশোক, কিংশুক, নবমল্লিকা প্রভৃতি ফুল, কোকিলের কুহুরব ও ভ্রমরগুঞ্জন মানবের মনে যেন চিরকাল জড়িয়ে আছে । এই সব ঋতুর অর্ন্তনিহিত ভাব, ব্যঞ্জনা ও বাণী যেন ফুলের বিকাশে ও পাখীর গানে মনের নিভৃত তন্ত্রীকে তোলপাড় করে তোলে । এইভাবে ঋতুর সঙ্গে প্রকৃতি ও মানবমন চিরন্তন লীলায় অবতীর্ন হয় । কোকিলের কুহুধবনি যেন বসন্তের যৌবন শিহরণের বাণী । কুহুধবনি যে বসন্ত প্রকৃতির মর্মগান । নিস্তব্ধ বসন্ত মধ্যাহ্নে কবি কুহুধবনি শুনে অতীত দিনের কাহিনীতে প্রবেশ করেছেন । কবি বলেছেন, কুহুধবনি অতীত যুগ থেকে নরনারী চিত্তকে আলোড়িত করে এসেছে । —

প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশ-লব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে,
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে
কুহুতানে করুণা বরিষে ।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর;
তখনো সে কুহুভাষা রমণীর ভালোবাসা
করেছিল সুমধুরতর । "[১] (কুহুধবনি / মানসী)

প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির তান্ডব নৃত্যের আলোড়ন পাওয়া যায় 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটিতে । নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতির উদ্দাম মত্ততা - ঝড়বৃষ্টির ক্ষিপ্ত মাতামাতির একখানি অপরূপচিত্র এই কবিতাতে ফুটে উঠেছে । 'মানসী'র পর সোনারতরী'তে এসে কবি এক অভিনব চেতনা ও প্রেরণা অনুভব করলেন । এখানে প্রকৃতি নিজস্ব নগ্ন সৌন্দর্য নিয়ে কবির চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে । প্রকৃতির রূপ -রস- ছন্দ-গানে কবি বিস্মিত, পুলকিত ও সচকিত হয়ে উঠেছেন । প্রকৃতি ও মানুষ কবির কাব্যে এক নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছে । এই প্রকৃতি ও মানুষের জীবন্ত স্পর্শ সম্বন্ধে কবি বহুকাল পরে লিখেছেন, - " আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি -- বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। ..... এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসলভরা হয়েছিল 'সোনার তরীতে' । "[২] (সূচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, বৈশাখ, ১৩৪৭)

'সোনারতরী'র নাম কবিতাটি রূপকধর্মী । শিলাইদহের গ্রাম্যপ্রান্তে, পদ্মার চরে, শ্রাবণমাসে, বর্ষার থৈ থৈ জলের মধ্যে ধান কাটার দৃশ্য কবি বহুবার দেখেছেন । মনে হয়, এ কবিতার ভাব, কৃষকের ধানকাটা ও নদীবাহিত কোনো নৌকায় তা উঠানোর জন্য অনুরোধ এবং নাবিকের উপেক্ষা - এসব দৃশ্য অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে । এই ভাবের কথা রবীন্দ্রনাথও চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখে একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, --

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২২৩
২. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৩৩

"-- ছিলাম তখন পদ্মায় বোটো জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা । নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে । কাটাধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙ্গি নৌকা হু হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে । এই অঞ্চ লে এই চরের ধানকে বলে জলিধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত। -- ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল - দিনের ছবি 'সোনারতরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্নওতার ছন্দে প্রকাশিত ।"[১]

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের একটা গূঢ় সম্বন্ধ রচনা করেছেন 'ভরাভাদরে' কবিতায় । বর্ষাকাল উচ্ছল পরিপূর্ণতার প্রতীক । বকুল, কদম্ব, কেতকী ফুলের মহাসমারোহে ধরণী আনন্দ - বিহবল হয়ে উঠেছে । বর্ষার পরিপূর্ণতার আবেগে প্রেম উপস্থিত হয়েছে। পরিপূর্ণ বর্ষায় কবিচিত্ত প্রেমের বিরহ গান গেয়েছেন। তরুশাখে ফুলের মেলা, পাখীর গান, নিভৃত পাতার আড়ালে কপোতের কূজন কবিকে বিহবল করে তুলেছে ।

সৌন্দর্য লক্ষ্মীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছে 'সোনার তরী' কাব্যে । সেই সৌন্দর্য লক্ষ্মীর উপসনা করেছেন 'চিত্রা' কাব্যের মধ্যেও । 'মানসসুন্দরী'তে তিনি এক নারীমূর্তির মধ্যে যে সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত হতে দেখেছেন, তাকেই তিনি বিশ্বসৌন্দর্যে উন্নীত করেছেন । সৌন্দর্যের আদিরূপকে তিনি পূজা করেছেন, তার জয়গান গেয়েছেন । কবি মনে করেন, বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতি সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আরাধনায় রত। —

"জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা,
* * *
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী ।।"[২] (উবর্শী / চিত্রা)

এই কাব্যপর্বে কবি জীবনদেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছেন । 'মানসী' থেকে 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত চলেছে কবির অনুভূত সৌন্দর্য প্রেমের মাধুর্যময় লীলা । এ লীলায় প্রবিষ্ট হয়েছে বিশ্বদেবতার মত গভীর অনুভূতি। বিশ্বকে ছাড়িয়ে বিশ্ব নির্মাতার ধ্যান করেছেন কবি 'গীতালি' পর্যন্ত । 'বলাকা'তে পেয়েছেন জগৎ ও জীবন পরিক্রমার গতি । 'পূরবী'তে পৌঁছে কবি আবার প্রেম ও সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানস দেহ আবার যেন বাসন্তী স্পর্শে লোভাতুর হয়েছে।

সংসার ক্ষুদ্র, জীবন ক্ষণিক -- এই কালচেতনা ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতায়। একশ বছর পরেও এই পৃথিবীতে প্রকৃতির সৌন্দর্য একইভাবে বজায় থাকবে। ঋতুর বিচিত্র রূপেরও কোন পরিবর্তন ঘটবে না । নববসন্তের যে আনন্দ - উন্মাদনা আজ কবি অনুভব করেছেন তা পরবর্তীকালেও সমভাবে বজায় থাকবে। কবি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেন তাঁর কাব্যের রসাস্বাদন করেছেন ।

---

১. চারুচন্দ্র বন্দ্যোধ্যায় ঃ রবিরশ্মি / পৃ. - ২২৯
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বি তীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১৭৯

"আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে ।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্মরে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে ।।"[১] (১৪০০ সাল / চিত্রা)

'কল্পনা'য় বিভিন্ন ভাবের কবিতাগুলি লক্ষ্য করার মতো । 'বর্ষামঙ্গলে', 'শরৎ', 'বসন্ত' এসব কবিতায় মানব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে । বর্ষা কবির অভিনন্দিত । শরৎ বাংলার ঐশ্বর্য - প্রাচুর্যময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্তির প্রতীক । রবীন্দ্রনাথ বসন্তের পুষ্প-সৌন্দর্যের মধ্যে চিরন্তন মাধুর্য, বৈশাখের মধ্যে তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য মূর্তি দর্শন করেছেন ।

নবযৌবনমত্তা বর্ষা বার বার কবির কাব্যবীণায় ঝংকৃত হয়েছে । 'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাতে নববর্ষার এক অভিনব রূপ ফুটে উঠেছে । সকল কবির অভিনন্দিত বর্ষার প্রতিচ্ছবির মিলিত রূপ ফুটে উঠেছে এ কবিতায় । 'এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা, / গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা, ... /শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে/ধবনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে/শতের যুগের গীতিকা ।"[২] (বর্ষামঙ্গল /কল্পনা)

কবি 'শরৎ' কবিতায় বাংলার শরৎ-ঋতুর সৌন্দর্য্য এবং 'বসন্ত' কবিতায় বসন্তের চির -যৌবনের বাণীকে প্রকাশ করেছেন । এই বসন্ত প্রকাশিত হয় জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, পুষ্পসম্ভারের মধ্যে । এছাড়া মানবের যৌবনের বিচিত্র কামনা, অশ্রু, পুলক, গান বিকশিত হয় বসন্তের মধুর সময়ে। কবি জানিয়েছেন, কবির যৌবনকালে ধরণীতে বসন্তের আবির্ভাব হয়েছিল। সে বসন্তের চম্পক, বকুল, চামেলী, রজনীগন্ধায় কবির যৌবন-কাব্যগাথা প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর পূর্বের শত শত যুবক যুবতীর যৌবন কামনা বসন্তের পুষ্পগন্ধের মধ্যে যুগযুগান্তরের জন্য সঞ্চি ত রয়েছে । প্রতি বসন্তে যুগ যুগান্তর ধরে কুসুমের সৌরভ জল -স্থল-শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। কবি বলেছেন, --

"বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহুকলস্বরে ।
অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মর নিশ্বাসে;
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।"[৩] (বসন্ত / কল্পনা)

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বি তীয় খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১৯৯
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১০৭
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১৬১

'বর্ষশেষ' কবিতায় কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝা প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন । বর্ষশেষের এই ঝড় নবজীবনের প্রতীক । কবি এই ঝড়কে তাঁর জীবনে আহবান করেছেন । 'বৈশাখ' কবিতায় তিনি সর্বত্যাগী, বৈরাগী রুদ্রদেবতাকে আহবান করেছেন।

'ক্ষণিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক আনন্দটুকুকে নিঃশেষে গ্রহণ করেছেন । মেঘমুক্ত বর্ষা প্রাতে পুকুর ঘাটে কবি সবাইকে আহবান করেছেন --

"ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে,
আয় গো আয় ।
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের
ভিজে পাতায় ।"[১] (মেঘমুক্ত/ক্ষণিকা)

বাংলার নদীর দুই পারের চমৎকার ছবি এঁকেছেন 'দুই তীরে' কবিতায় । এক অপরূপ গ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন এখানে --"নদীর বালুচর, / শরৎকালে যে নির্জনে / চকাচকীর ঘর । / যেথায় ফুটে কাশ / তটের চারিপাশ, / শীতের দিনে বিদেশী সব / হাঁসের বসবাস"[২] (দুইতীরে/ক্ষণিকা)। বর্ষার সজল, অপরূপ সৌন্দর্যের রূপ দেখেছেন কবি । মেঘের গুরুগুরু গর্জন, বাদলের ধারা, দোলায়মান নবীন আউশ ধান, ভিজে পায়রা, ভেকের একটানা ডাক, নবীন বর্ষা প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন তিনি । নদীর পাড়ে ঝরে পড়া মালতীফুল, ঝর ঝর করে বকুলের ঝরে পড়া, বর্ষা ধৌত নির্মল প্রকৃতি কবিকে আনন্দ বিহবল করে তুলেছে । ময়ূরের মত কবির হৃদয় বর্ষায় নেচে উঠেছে । --

"হৃদয় আমর নাচে রে আজিরে,
ময়ূরের মতনাচেরে ।"[৩] (নববর্ষা/ক্ষণিকা)

'খেয়া' কাব্যের 'বৈশাখ' কবিতায় বৈশাখের গ্রীষ্মতপ্ত প্রকৃতির মধ্যে অজানা স্পর্শ অনুভব করেছেন। কবি গ্রীষ্মের দুপুরে শুনেছেন মাঠের সারি বাঁধা তালের বনে তপ্ত বাতাসের শন্ শন্ শব্দ । শুনেছেন, মৌমাছিদের গুঞ্জন, মহুল শাখার মর্মরধবনি, দেখেছেন আমলকির কচি পাতার নাচন ।

বর্ষাধৌত প্রভাতে নীল আকাশের সূর্যকিরণ প্রকৃতির উজ্জ্বলতাকে স্নিগ্ধ করেছে । সোনার জোয়ারে টলমল পৃথিবীকে একেঁছেন 'বর্ষাপ্রভাত' কবিতায় । 'ঝড়' কবিতায় এলোমেলো হাওয়ায় কবিমন চঞ্চ ল হয়ে উঠেছে ।

তিনি প্রকৃতির রূপ-রস-শব্দ - গন্ধকে ঋতুর আবেশে উপলব্ধি করেছেন ।

'ঘাসের পাতার মাটির গন্ধ
কতো ঋতুর কতো ছন্দ,
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল,
নীড়ে গাওয়া গানের সাথে ।'[৪]

'বর্ষাসন্ধ্যা'তে কবি জীবনস্বামীর আলিঙ্গন চেয়েছেন --

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২৫২
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২২১
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২৩১
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২০১

"আমায় অমনি খুশি করে রাখো
কিছুই না দিয়ে,
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে ।"[১] (বর্ষাসন্ধ্যা/খেয়া)

ভগবানকে একান্ত করে পাবার জন্য আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে 'গীতাঞ্জলি' তে । বর্ষার যে অকারণ বিরহ বেদনা, তা কবির ভগবদ বিরহ বেদনায় পরিণত হয়েছে । "তুমি যদি না দেখা দাও / কর আমায় হেলা, / কেমন করে কাটে আমার / এমন বাদল বেলা"[২] (১৬ নং/গীতাঞ্জলি)।

'আজি শ্রাবণঘন-গহন মোহে'[৩] (১৮ নং) 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল'[৪] (১৯ নং) । 'আজবারি ঝরে ঝরঝর/ভরা বাদরে'[৫]। (২৭ নং) - কবিতাগুলি বর্ষার পটভূমিতে রসোচ্ছল হয়ে উঠেছে ।

কবি রবীন্দ্রনাথ প্রিয়তমের সংবাদ পেয়েছেন শরতের আলো ছায়াময় পরিবেশে।--

"শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরাফুলের রাশে রাশে,
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে / নয়ন ভুলানো এলে ।"[৬] (১৩ নং / গীতাঞ্জলি)

দক্ষিণ হাওয়ার সঙ্গে আসে বসন্ত। প্রেমের গোপন কাহিনী চলতে থাকে। এসময় কত দিনে-রাতে, শীতে বসন্তে, সুখে-দুঃখে যে প্রেমের লীলা চলেছে। তারই আশায় কবি নিরুদ্দেশের পানে ছুটে চলেছেন। পুরাতনের জড়তা ধবংস করে যৌবন দুর্বার গতিতে নতুন জীবনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

"সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা।"[৭] (সবুজের অভিযান / বলাকা)

বিশ্বে দুটি শক্তির সামঞ্জস্য-বিধান করেছেন বিশ্বস্রষ্টা - এক, প্রলয়ংকরী শক্তি, দুই- কল্যাণী শক্তি। একটি ফুল ফোটায়, অপরটি ফল ধরায়। একটি উর্বশী, অন্যটি লক্ষ্মীর মূর্ত্তি। ঋতুর আধারে প্রকাশিত দুইরূপ — হেমন্ত ও বসন্ত। — "একজন তপোভঙ্গ করি / উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি / নিয়ে যায় প্রাণমন হরি, / দুহাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে, / রাগরক্ত কিংশুকে যৌবনের গানে / নিদ্রাহীন যৌবনের গানে / আর জন ফিরাইয়া আনে / অশ্রুর শিশির স্নানে / স্নিগ্ধ বাসনায়, / হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;/ ফিরাইয়া আনে / নিখিলের আশীর্বাদ পানে / অঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য - সুধায় মধুর।"[৮] (বলাকা)

সৃষ্টির গতিবেগের মধ্যে রীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্ভার প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তবুও এই ধরণীর মাটি,

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২০৩
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২১
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৩২
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১৯
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২৪৩
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২৪৪

জল, জীবনের স্নেহ-প্রেম, সুখ-দুঃখের সহস্রবন্ধন একান্তভাবে সত্য। ধুলা-মাটির এজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন কল্পনা করলেই মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। 'মুক্তি' কবিতাটিতে এই ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। নয় বছরের মেয়ে, বধূ হয়ে স্বামীগৃহে প্রবেশ করলো। বৃহত্তর জগৎ থেকে ক্রমশ তাকে বদ্ধ দশাতে আনা হল। তারপর তাকে রোগ আক্রমন করল। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে খোলা জানলার পথে সে প্রথম বিশ্বপ্রকৃতির স্পর্শ পেল।-

"প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে —
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীনায় নিদ্রাবিহীন শশী।"[১] (মুক্তি / পলাতকা)

'বসন্ত যাপন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঋতু পরিবর্তনের বিচিত্র রূপ পরিবেশন করেছেন। দীর্ঘ শীতের পর বসন্তলক্ষ্মী হাওয়া - পাতা - রঙ বদলায় সমস্ত বনে - উপবনে ও মানবমনে। তখন প্রাণের কত অজস্রতা, বিকাশের কত উৎসব। আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতাগুলি পাগল হয়ে ওঠে, হিসাবের বোধমাত্র থাকে না — "যেখানে দুটো ফল ধরে সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে"। তারপর আসে অনুতাপের দিন, বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠের খরায় চুপ করে মাথা পেতে নেয়। 'ছিন্নপত্রাবলী'র চিঠিগুলোতে ঋতুগুলি নারী ও পুরুষরূপে চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছয়ঋতুকে নিয়ে বর্ণনা করেছেন এভাবে — "রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন / স্বর্ণরাজছত্র উর্ধ্বে করেছে ধারণ / শুধু তোমাদের পরে, ছয় সেবাদাসী / ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি; / নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা / নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা/তোমাদের তৃষিত যৌবনে;ত্রিভুবন / একখানি অন্তঃপুর, বাসভবন।"[২] (ঋতুসংহার / চৈতালী)

জগতের সৌন্দর্য ও জীবনের মাধুর্যের মধ্যে অফুরন্ত প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাস দেখেছেন। কবির প্রাণের সাথে সৌন্দর্যলোকের সংযোগ সাধন করেছেন। ঋতুর চলার সঙ্গে কবিও চলেছেন — চলার পথে কোন ব্যবধান নেই।

"আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে,
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।"[৩] (মাটির ডাক / পূরবী)

পৃথিবীর বুকে কবি দেখেছেন অজস্র সৌন্দর্যের আয়োজন। আশ্বিনের ফসল ক্ষেতে কচি ধান খামখেয়ালি খেলায় মেতেছে। কবি তাঁর প্রথম জন্মদিনের শুভক্ষণে আহবান করেছেন তরুণ নবজাতককে, যেদিন "বসন্তের জয়ধবজা ধরি / শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি — "[৪] (পঁচিশে বৈশাখ)।

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১০
২. তদেব ; পৃ. - ৯৭
৩. তদেব ; পৃ. - ৯৯
৪. তদেব ; পৃ. - ৯৮

'আগমনী' কবিতায় কবি বার্ধক্যে আবার যৌবনের শুভাগমন অনুভব করেছেন। মাঘের শীতে প্রকৃতি জড়তায় আচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ তার বুকে বসন্তের আবির্ভাব হল। দখিন হাওয়ায় বসন্তের আগমনী সূচনা হয়েছিল। কোকিল, দোয়েল, শামা, কপোত -পাখিরা গেয়ে উঠেছিল। আমের বকুলের গন্ধে বাতাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। বনে বনে মাধবী, শিরীষ, কনকচাঁপা, মল্লিকার - এসব ফুলেরা দলবেঁধে একসঙ্গে হাজির হয়েছে। সারা বিশ্বে বসন্তের আগমনে অপূর্ব চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে।

প্রকৃতির ছয় ঋতুর আবর্তনের মতো মহুয়া কাব্যেও ঋতুর প্রসঙ্গ আবার ফিরে এসেছে নবরূপে। কবির মনের এ ঋতু 'বলাকা' বা 'পূরবী'র ঋতু নয়, 'মহুয়া' কাব্যের ঋতু স্বতন্ত্র ভাবে এসেছে। কবি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন — "বারোমাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে ঋতু যায় সে আর এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা করে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না এ হতেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মতো"[১] (ভূমিকা/মহুয়া)।

'বনবাণী' কাব্যে দেখি প্রকৃতির ঋতুগুলি নব নব নৃত্যে মেতে উঠেছে। নটরাজ শিব ষড় ঋতুর ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে নৃত্যলীলায় অবতীর্ণ হয়েছে। বৃক্ষরোপন উৎসবে কবি বর্ষা ঋতুর বন্দনা করেছেন। কবির কাছে বসন্ত চির-নূতন ও চির-যৌবনের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাহিত্য-সাধনায় আমরা দেখেছি ষড় ঋতুর বিচিত্রভঙ্গিতে বারবার আনাগোনা ঘটেছে। 'নবজাতক' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন —

> "আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হতে থাকে তখন মৌমাছিদের মধু জোগান নতুন পথ নেয়। ... কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এ তো স্বাভাবিক, কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। .... এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।"[২]

কবির প্রৌঢ় ঋতুর ফসল 'বলাকা' থেকে নানা কাব্যপর্যায়ে নানারূপে পেয়েছি। আসন্ন জীবন-চেতনার গোধূলিবেলায় কবির চরম আকাঙ্ক্ষা, —

> "এজনমে
> শেষত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নব বসন্তের
> আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছে যথা।
> যার লাগি আশাপথ চেয়ে আছ সে নহে সম্মান,
> সে জাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক।।"[৩] (১২ সংখ্যক / প্রান্তিক)

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে আমরা পেয়েছি ফসল কাটার গান। সেগান পৌষের গান। এই পৌষ গানে রয়েছে তৃপ্তির আনন্দ, মুক্তির আনন্দ। আবার এ নাটকের মধ্যে রয়েছে আগমনীর সুর। রাজার সংলাপের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আগমনীর সুর। নন্দিনীর উদ্দেশ্য রাজা আবেগময় কণ্ঠে বলে —

> "আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাইনে।
> যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর
> লগ্ন লাগবে।"[৩] (রক্তকরবী / রবীন্দ্রনাথ)

এই আগমনী সুর রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'তেও শোনা যায়। সেখানে রয়েছে সাত-মহলা বাড়ি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৯৮
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১০৩
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ১১৬
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৩৬৫

ঐশ্বর্য, শরৎ প্রভাতে শুকতারার আলোর স্নিগ্ধতা, শিউলি বনের শিউলি ফুল, ভোরের দোয়েল পাখি এবং শিশুর খিলখিল হাসি। ডঃ শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী 'রক্তকরবী'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

> "ঋতু চক্রের লীলায় বারবার নতুন হয়ে ওঠার ও ভরে ওঠার আনন্দে প্লাবিত হয় বিশ্বচরাচর। খুশি হয় ধরা, খুশি হয় আলো, খুশি হয়ে ওঠে আকাশ। সেই খুশির উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্যে অখিল জীব জগৎকে বিশ্বপ্রকৃতি নিরন্তর ডাক দেয় - আয়রে চলে আয়, আয়, আয়।"[১]

প্রমথনাথ বিশী 'রক্তকরবী' নাটক সম্পর্কে বলেছেন এটি একটি শীত ঋতুর নাটক। কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন, 'রক্তকরবী'তে সবঋতুর উপস্থিতি রয়েছে।

'শারদোৎসব' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' নাটক প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, —

> "শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি, তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়াটা, একরাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে শারোদোৎসব করার জন্য। তিনি খুঁজেছেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন চোরো শারদ প্রকৃতির আনন্দযোগ দেবার জন্য উৎসব করতে বেরিয়েছে।"[২]

শীতের মধ্য দিয়ে বসন্তের আগমন হল 'ফাল্গুনী' নাটকের পটভূমি। পুরাতন চলে যায়, নতুন আসে, জন্মালে মরিতে হয়, সবই লীলার প্রকাশ। ফাল্গুনীর যুবকেরা মৃত্যুর সন্ধানে বেরিয়েছে। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয়, লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছানো যায়। তাই মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। 'বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা'[৩]। — এই হল 'ফাল্গুনী'র প্রাণের কথা।

সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' থেকে শুরু করে অনেক কবির লেখনিতে বর্ষার আষাঢ় মাস একটা আলাদা গুরুত্ব পেয়েছে। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'[৪]-- (মেঘদূত / কালিদাস) -- 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে'[৫] (রবীন্দ্রনাথ), -- সুকুমার রায় লিখলেন --

> 'কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য,
> আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য।'[৬] -- (বর্ষার কবিতা / সুকুমার রায়)

সুকুমার রায় 'বর্ষার কবিতা'তে ছোটদের বরষা নিয়ে বললেন,-- 'সারাদিন ঘনঘটা কালো মেঘ আকাশে / ভিজে ভিজে পৃথিবীর মুখখানা ফ্যাকাশে। ..... মাটি হল ছেলেদের ফুটবল খেলাটা।'[৭] ছোটো শিশুদের মতো বিরামহীন অফিসের বাবুদের কাছে বর্ষা দুঃখজনক। জুতা হাতে, ছাতা কাঁধে নিয়ে

---

১. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী ঃ রক্তকরবী ও অন্যান্য/ সুজন প্রকাশনী ঃ কলকাতা-৯ / প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১২, / পৃ. - ৫৭
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২৫৮
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ৪১৫
৪. মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃকালিদাসের গ্রন্থাবলী/প্রথম ভাগ/বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ ঃ কলিকাতা -১২,বারানসী ধাম অনন্ত চতুদর্শী ১৩৩৬,পৃ- ২৪২
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) / বিশ্বভারতী; কলকাতা-১৭ / পৌষ -১৪১৭, পৃ. - ২২৮
৬. সুকুমার রায়চৌধুরী ঃ সুকুমার রচনা সমগ্র / সাহিত্যম্; কলকাতা ৭৩ / প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ২০০২, পৃষ্ঠা ৭১
৭. তদেব ; পৃ. - ৭২

কোথাও ঘন কাদা, কোথাও হাঁটুজল, কোথাও পিছল পথে পড়ে যাওয়া -- এসব ক্লেশকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় অফিসের বাবুদের । তাই এদের মুখে ফূর্তি দেখা যায় না বর্ষাকালে । তবে এই বর্ষায় ব্যাঙেরা আহ্লাদে গদগদ হয়ে মহাসভায় গলা ফাটায়। শিশুদের কবি সুকুমার রায় কচিকাচাদের পাকাপাকি হাস্যরসাত্মক এবং নীতিমূলক কবিতা শুনিয়েছেন --'আমপাকে বোশেখে কুল পাকে ফাগুনে', আর 'জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে ।'

ছটি ঋতুর আবর্তনকে লক্ষ্য করে কবি লিখেছেন 'বর্ষ গেল, বর্ষ এল' কবিতা । লক্ষ্য লক্ষ্য যুগের প্রথানুযায়ী কাঁটায় কাঁটায় নিয়মের হিসাবানুযায়ী ঋতুরা চলাচল করে । যদিও বর্তমানে তা ঘটে না । ঋতুর ঘূর্ণিপাককে অতি সহজ ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন -- "বর্ষ গেল, বর্ষ এল. গ্রীষ্ম এলেন বাড়ি, / পৃথ্বি এলেন চক্র দিয়ে এক বছরের পাড়ি ।"[১] এ কবিতায় তিনি ছয় ঋতুর বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলেছেন -

"গ্রীষ্মকালের তপ্ত রোদে বর্ষাকালের মেঘে,
শরৎকালের কান্নাহাসি হালকা বাদল হাওয়া
কুয়াশা ঘেরা পর্দা ফেলে হিমের আসা - যাওয়া ।
শীতের শেষে রিক্ত রেশে শূন্য করে ঝুলি,
তার প্রতিশোধ ফুলে ফলে বসন্তে লয় তুলি ।।"[২] -- (বর্ষ গেল, বর্ষ এল)

কবি সুকুমার রায় 'গ্রীষ্ম' ঋতুকে নিয়ে ছোটদের জন্য ছড়া লিখেছেন । বৈশাখ মাসের সঙ্গে শুরু হয় গ্রীষ্ম ঋতু । এদিনে শুষ্ক তপ্ত পৃথিবীর অঙ্গ ধূলিমাখা হয় । গ্রীষ্মের ঝলসানো রোদে প্রকৃতির ঘাস-ফুল শুকিয়ে যায় । গরমে শরীরে ঘর্ম ছোটে, হাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ । তৃষ্ণার্ত হৃদয়, মুখে কথা ফোটে না । মাঝে মাঝে কালবৈশাখীর রুদ্ররূপ দশদিককে ধূলিময় করে তোলে । গ্রীষ্মের রুদ্রবেশে ত্রিভুবন ভস্ম হয়ে গেলেও, ছোটদের কাছে কিছু ভালোলাগার বিষয় এসময় দেখা যায় -- 'আম পাকে, জাম পাকে, ফল পাকে কত যে' । গ্রীষ্মে এই বিভিন্ন ফল, শস্য পাকার সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ছেলেদের দুরন্তপনা শিশু কবি দেখেছেন --

"বুদ্ধি যে পাকে কত ছেলেদের মগজে ।"[৩]-- (গ্রীষ্ম)

'গ্রীষ্ম' নামক আর একটি ছড়ার ছন্দে লেখা কবিতায় কবি ভয়ংকর রূপ প্রকাশ করেছেন । জানিয়েছেন গ্রীষ্মের দাবদহে অস্থির প্রাণ মুক্তির উপায় খোঁজে, ভগবানের শরণাপন্ন হয় । --- "আকাশতলে অগ্নি জ্বলে স্থলে / তপ্ত নিশ্বাস ছুটছে বাতাস ঝলসিয়ে ঘাস, / শুকনো শ্মশান যায় বুঝি প্রাণ হায় ভগবান।/ ফিরছে সবায় জল নাহি পায় হায় কি উপায় ।"[৪] --- (গ্রীষ্ম)

পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠ, রোদ, আলো, মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, আকাশ, বাতাস -- এসবের মাঝে ঋতুর অনিন্দ্য সুন্দর রূপ ফুটে ওঠে । যুগে যুগে সাহিত্যিকরা ঋতুর এইরূপ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে কত শিল্প সৃষ্টি করছেন। রোমান্টিক পাঠকেরাও ঋতুর রূপে মুগ্ধ হয়ে গভীর আনন্দ পেয়ে থাকে। ঋতুর চির নতুন আগমন ও প্রত্যাবর্তন সাহিত্যকে উজ্জ্বল ও উচ্ছল করে তুলেছে ।

---

১. সুকুমার রায়চৌধুরী ঃ সুকুমার রচনা সমগ্র / সাহিত্যম্;কলকাতা ৭৩ / প্রথম সংস্করণ, বইমেলা ২০০২, পৃষ্ঠা - ১০২
২. তদেব ;পৃ. - ১০২
৩. তদেব ;পৃ. - ১০৪
৪. তদেব ;পৃ. - ১২৩